ওঙ্কার

ক্ষমতা, মিডিয়া ও সক্রিয়তা বিষয়ক চিন্তা-অনুশীলন প্রচেষ্টা

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

১

এপ্রিল ২০০৮ ॥ বৈশাখ ১৪১৫

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন: জরুরী পর্ব

আইনের শাসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ

কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার স্ব-দায়িত্ব

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন: জরুরী পর্বের একটি জরুরী পাঠ ও বিবেচনা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরায়ন: 'নিপাট মূক-ভাষাহীন-মৌলবাদী' প্রতিকৃতির ময়না-তদন্ত

বিচ্ছিন্ন ভাবনার কোলাজ...

আন্দোলনের কর্তৃত্ব-বিরোধী ধারা: ইশতেহারের মূল প্রস্তাবনা

সম্পাদকীয়

সমাজ বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনায় রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ। খুব সহজ অর্থে রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতা সংস্থানের আর্ট, বিজ্ঞান ও চর্চা। ফলে রাজনীতি মানেই ক্ষমতা প্রশ্ন। প্রকৃতপক্ষে সমাজ বিকাশের ইতিহাস এখন পর্যন্ত ক্ষমতার উত্থান-পতনেরই ইতিহাস। কেননা সমাজের নানান ধরনের সম্পর্ক, ক্ষমতার নিগড়ে— ক্ষমতারই ছাঁচে গড়ে উঠেছে। সমাজের নানান ধরনের প্রথা-প্রতিষ্ঠান-সংস্কৃতি তথা জ্ঞান-বিশ্বাস-কলা-নীতি-নিয়ম-সংস্কার প্রভৃতির নির্মাতা হচ্ছে ক্ষমতা। ক্ষমতা নির্মিত এই অনুসঙ্গগুলো সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসকে ক্ষমতা সম্পর্কের বিন্যাসের একেকটা রূপ হিসেবে জাহির করে। ফলে ইতিহাসকে ক্ষমতা সম্পর্কের বিবর্তন-বিকাশ হিসেবে পাঠ করা সম্ভব।

ক্ষমতা সর্বগামী ও সর্বব্যাপী। মানুষের যুথবদ্ধতার সূত্রকে ভেঙ্গে বল প্রয়োগের শর্ত ও সূত্র নির্মাণের মধ্য দিয়েই ক্ষমতার উৎপত্তি ও বিকাশ। ক্ষমতার উৎপত্তি ও বিকাশই হচ্ছে ক্ষমতার ইতিহাস। বিভিন্ন যুগপর্বে ক্ষমতা সম্পর্কের বিন্যাসে যে পরিবর্তন ও বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার মাধ্যমেই ক্ষমতার ঐতিহাসিক পঠন-পাঠন সম্ভব হয়। ক্ষমতার ইতিহাসের পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়েই সমাজের মধ্যে প্রবাহমান জ্ঞান-শাস্ত্র-সক্রিয়তা প্রভৃতির কর্তৃত্বপরায়ন আধার-আধেয়কে চিহ্নিত করা সম্ভব। আবার সমাজ সম্পর্কের বিন্যাসে সামাজিক কাঠামো-স্তর-শ্রেণী প্রভৃতির মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্যকে ঐতিহাসিকভাবে পাঠ করতে গেলে এবং আগামী দিনে মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটিকে মোকাবিলা করতে হলে, ক্ষমতার ইতিহাসের পঠন-পাঠন অত্যন্ত জরুরী। এই সর্বব্যাপী ক্ষমতার ঝোঁক-প্রবণতা ও বিন্যাসকে প্রশ্ন করতে করতে বোঝাপড়া করার দায়কে আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্তব্য বলে নির্ধারণ করেছি।

ক্ষমতা এমনি এমনি টিকে থাকে না। তাকে টিকে থাকার জন্য শর্ত নির্মাণ করতে হয়। এই শর্ত নির্মাণের জন্য ক্ষমতাকে ভাষা-সংস্কৃতি-জ্ঞানগত এলাকায় সম্মতি উৎপাদন তথা সামাজিক সর্বমান্যতা তৈয়ার করতে হয়। সমাজের আধিপত্যশীল ব্যক্তি-গোষ্ঠী-দল প্রভৃতির স্বার্থে ক্ষমতার ব্যবহারকে বৈধ করার জন্য জনগণের মগজ ধোলাই করা হয়। এই মগজ ধোলাইয়ের জন্য ক্ষমতাকে মতাদর্শিক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হয়। সমাজের প্রবাহমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সিস্টেমটাকে টিকিয়ে রাখতে মতাদর্শ উৎপাদন ও তার প্রসারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তথা হাতল নির্মাণ জরুরী হয়ে পড়ে। মিডিয়া হচ্ছে ক্ষমতার হাতল।

ক্ষমতা-তাড়িত মিডিয়ার চরিত্র ক্ষমতার চরিত্রেরই অনুগামী। বর্তমানের বৈশ্বিক ক্ষমতাশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভারকেন্দ্র হচ্ছে কর্পোরেট। মুনাফামুখীন কর্পোরেট কর্তৃত্বতন্ত্রের তথা মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে মিডিয়া হচ্ছে পণ্য-সভ্যতা নির্মাণের 'হাতিয়ার'। শেকড়ের টান থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, তার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে মিডিয়া ক্রমাগত ভাবে মানুষকে 'উন্নতমানের ভোক্তায়' রূপান্তর করছে। মানব সমাজের মধ্যে ক্রমাগত ছদ্ম-বাসনা তৈরি করে তাকে 'খাদক সমাজে' রূপান্তর করা হচ্ছে। সৃজনশীলতা-শিল্পমূল্য প্রভৃতিকে বাজারী উৎপাদন এবং বাজারমূল্যে পরিমাপ করার দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করা মিডিয়ার ঝোঁক-প্রবণতার একটি বিশেষ দিক।

আবার ভাষিক জগতে বিবর্তন এবং ক্ষমতার অনুগামী অর্থ চর্চার মধ্য দিয়ে একটি যুগের, একটি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি নির্মাণ মিডিয়ার কর্মকাণ্ডের পরিসরের অন্তর্ভুক্ত। ফলে মানুষের সামগ্রিক জীবন-যাপন প্রণালীর নির্ধারক হয়ে দাঁড়িয়েছে মিডিয়া। মিডিয়ার আধার-আধেয়, তার সাথে অপরাপর প্রপঞ্চের সম্পর্ক এবং তার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চরিত্র ও কর্মতৎপরতা প্রভৃতিকে বোঝা এবং মিডিয়া-তাড়িত জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধে পাল্টা জ্ঞানকাণ্ড প্রচার-প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা গড়ে তোলা আমাদের চিন্তা-দাসত্ব থেকে মুক্তির কর্তব্য বলেই আমরা মনে করি।

ক্ষমতা-দাসত্বের কবল থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন, মানুষের মুক্তিমুখীন আকাঙ্ক্ষারই বহিঃপ্রকাশ। আন্দোলনের অভিজ্ঞতা-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-পরিণতি সর্বোপরি আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বিচারকে ভিত্তি করে এবং অপরাপর আন্দোলনের সাথে তার সম্পর্ক অনুসন্ধান করেই একটি বৃহত্তর আন্দোলনের নানান ধারায় তত্ত্বায়ন সংগঠিত হয়। এই তত্ত্বায়নের উপর ভিত্তি করেই চলতে থাকে নানামুখী সক্রিয়তা-তৎপরতা। সক্রিয়তা যেহেতু আন্দোলনের তত্ত্বায়নেরই অনুগামী তাই মানুষের মুক্তির আন্দোলনের নানান ধারাকে প্রশ্ন করা, তার মধ্য থেকে মুক্তিমুখীন উপাদানকে চিহ্নিত করা এবং তত্ত্বায়নের সীমাবদ্ধতাগুলোকে সমালোচনা করা ইত্যাদির মাধ্যমে সক্রিয়তার সঠিক রাস্তাটা বের করা আমাদের কর্মতৎপরতার একটি বিশিষ্ট এলাকা।

ওঙ্কার মূলত ক্ষমতা, মিডিয়া ও সক্রিয়তা বিষয়ক চিন্তা ও অনুশীলনের জন্য সংগঠিত একটি এ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপ। *ওঙ্কার*-এর কর্মতৎপরতার মধ্যে ক্ষমতা, মিডিয়া ও সক্রিয়তা বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার জন্য পঠন-পাঠন, গণক্লাস, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রকাশনাসহ সম্ভাব্য বিভিন্ন মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন এবং সমাজ ও নানান ধরনের আন্দোলন ও তৎপরতার ক্ষেত্রগুলোতে প্রণোদনা সৃষ্টি— প্রভাবন, মত সংগঠন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ওঙ্কার-এর এবারের পঠন-পাঠনের বিষয় সাম্প্রতিক বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন। সাম্প্রতিক বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের সাথে জড়িত প্রশ্ন ও সম্পর্কগুলোকে পাঠ করা এবং জনসাধারণের সামনে তা সহজবোধ্য করে হাজির করার উদ্দেশ্যেই *ওঙ্কার*'র এই প্রকাশনা-প্রচেষ্টা।

সমাজের সবচেয়ে স্বাধীন ক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। সমাজের অন্যান্য অংশের থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার ক্ষেত্র অনেক বেশি প্রসারিত। কিন্তু এই স্বাধীনতাও সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্র-রাজনীতির কর্তৃত্বের শূঁড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঙ্ক্ষিত ও চর্চিত স্বাধীনতাকে ভুলুণ্ঠিত করে ফেলেছে। আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধ্রুপদী জ্ঞান চর্চাকেই প্রমিত হিসেবে নির্ধারণ করেছে। ধ্রুপদী জ্ঞান চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুষঙ্গ হিসেবেই এখানে উপস্থিত হয় এক ধরনের প্রতিবাদী-প্রতিরোধী জ্ঞান চর্চা। যা বৃহত্তর অর্থে মুক্ত বুদ্ধি চর্চা নামে পরিচিত। সাম্প্রতিক আগস্ট ২০০৭-তে সংগঠিত ছাত্র বিক্ষোভ এবং পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র-রাজনীতির রোষানলের শিকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কারামুক্ত করার জন্য, যে আন্দোলন সংঘটিত হলো তার মূলে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষা এবং মুক্ত চিন্তা ও বিবেকের অধিকার সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার। ফলে 'জরুরী অবস্থায়' জরুরী প্রতিবাদ হিসেবে আবির্ভূত এই আন্দোলনের ঝোঁক-প্রবণতাগুলোকে চিহ্নিত ও চিত্রিত করার প্রচেষ্টা— এই প্রকাশনা।

এই প্রকাশনায় যে লেখাগুলো পত্রস্থ হলো তা বৃহত্তর অর্থে শুধুমাত্র ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মৌলিক নীতিতে সহমত পোষণ করে। কিন্তু সামগ্রিক আন্দোলনের ঝোঁক-প্রবণতাগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে প্রকাশ করে লেখাগুলোর মধ্যে কোনো ধারাবাহিক ঐক্য-সম্পর্ক পাঠক খুঁজে পাবেন না। *ওঙ্কার*-এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিংবা সাম্প্রতিক বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের কর্মী-সংগঠকদের চিন্তা-ভাবনার প্রচেষ্টাগুলোকে প্রকাশনায় প্রাধান্য দিতে গিয়ে সেই সম্পর্ক নির্মাণ করা সম্ভব হয় নি। তবে এই প্রকাশনার মাধ্যমে আন্দোলনের কর্তৃত্ব-বিরোধী ধারার তত্ত্বায়নের একটি সীমিত প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা আমাদের ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং মানবতার অধিকার সমুন্নত রাখার প্রত্যয়ে আগামীতে আমাদের কর্মতৎপরতার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। এই সামগ্রিক প্রকাশনা-প্রচেষ্টায় কোনো অসঙ্গতি পাঠকের নজরে আসলে তার তীব্র সমালোচনা আমরা দাবি করছি। আমরা মনে করি এই সমালোচনা আমাদের প্রশ্ন-প্রবণতা ও অনুসন্ধানকে আরো উজ্জীবিত করবে।

সম্পাদনা পরিষদ
০৪.০৪.২০০৮

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এবং দৈনিক প্রিন্টিং ওয়ার্কাস, গণকপাড়া, (মুক্তা আবাসিক হোটেলের পেছনে) রাজশাহী থেকে মুদ্রিত
সম্পাদনা পরিষদ: রেজাউর রহমান, সারোয়ার হোসেন সুমন, মেহেদী হাসান প্রান্ত, মোহাম্মদ আলী রুবেল, রেজাউল পারভেজ, গোলাম রাব্বানী, আরিফ রেজা মাহমুদ, রীমা পারভীন
প্রচ্ছদ, মুদ্রাক্ষর বিন্যাস ও পৃষ্ঠাসজ্জা: পার্থ প্রতীম দাস, প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জার আলোকচিত্র: মামুনুর রশীদ ॥ যোগাযোগ: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রবীন্দ্রভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ॥ সেল ফোন: ০১৯১২১৮৬০৩১, ০১৭১৯২১২০৭২, ০১৭১৭৫৯০১০৭ ॥ ই-ডাক: arifrezamahmud_mc@yahoo.com ॥ অনলাইন সংস্করণ: মানুষ নেটওয়ার্কের 'ছোট কাগজ সংগ্রহ' অংশ (manooshnetwork.org)

বিনিময়: ২০ টাকা

আইনের শাসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ

সেলিম রেজা নিউটন

সামান্য পরিবর্তিত শিরোনামে এই লেখাটির দুই-তৃতীয়াংশের মতো দৈনিক *সমকাল* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল গত ১৮ই জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে। সেখানে ছাপার উপযোগী করে তুলতে পত্রিকার পক্ষ থেকে দৈর্ঘ্য কমাতে বলা হয়েছিল এবং সেনা-সম্পর্কিত জায়গাগুলো বাদ দিতে বলা হয়েছিল। সেদিক থেকে এটি সাম্প্রতিক স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপের একটি নমুনা হিসেবে বিবেচনার যোগ্য বটে। এখানে লেখাটির আদি পূর্ণ বিবরণ পেশ করা হলো। এটি প্রায় ২৯০০ শব্দের লেখা। আর *সমকাল*-এ ছাপানো লেখাটিতে ছিল ১৬৫০-এর মতো শব্দ। *সমকাল*-এ লেখাটি ছাপানোর জন্য আমি শ্রদ্ধাভাজনেষু মোজাম্মেল হোসেন মঞ্জু ভাইয়ের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। — স.র.ন.

কানাকে হাইকোর্ট দেখানো এ-দেশের মানুষের মুখের বুলি হিসেবে পুরোনো। কত অজস্র মানুষের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা এই বুলির ভেতরে জমা আছে তা অনুভব করা সম্ভব। কানাকে হাইকোর্ট দেখানো কিন্তু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠারই নামান্তর; এবং বলা বাহুল্য নয়, আমাদের দেশে আইনের শাসন সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহান বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী। তাঁরা বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে ক্রমাগতভাবে এখানে আইনের শাসন ভেঙে পড়তে থাকে। অবশেষে নয়া ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের অনুমোদনপুষ্ট একটি আমলা-ব্যবসায়ী-সামরিক শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্বে বিগত ১১ জানুয়ারি ২০০৭ সাল থেকে বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমরা শুনে আসছি। শোনা কথা হলেও কথাটা সত্য। কোটিপতি থেকে শুরু করে নিঃস্ব ভিক্ষুক পর্যন্ত সারাদেশের লোক সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তো বটেই, শিক্ষকরাও বাদ যান নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কানা ছাত্র-শিক্ষকদের রীতিমতো হাইকোর্ট দেখিয়েছে এই সরকার। কিন্তু, আমরা—শিক্ষকেরা—সরকারকে আক্ষরিক অর্থে হাইকোর্ট দেখানোর আগেই মানুষের দাবি এবং গণ-অনুভূতির কাছে নতি স্বীকার করে সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজাপ্রাপ্ত চার জন শিক্ষককে মুক্তি দিয়েছে। সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল দুই সপ্তাহের ভেতরে ঢাবি'র চার শিক্ষককেও মুক্তি দেওয়া হবে। ছাত্রদেরকেও মুক্তি দেওয়ার কথা ছিল। সরকার কথা রাখে নি। সময়ক্ষেপন করেছে। সরকারের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং শিক্ষক সমিতির নেতাদের ঠিক কোন কোন দিক থেকে আলোচনা চলছিল তার বিস্তারিত আমি জানি না। আলোচনা ভেঙেই বা গেল কেন তাও অজানা। কিন্তু আমি যেটা জানি, সারাদেশের লোক এরই মধ্যে বুঝে ফেলেছে, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আনা মারাত্মক অভিযোগগুলো স্রেফ বানানো কেচ্ছা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণের কোনো পরিকল্পনা কোনো মহলে আদৌ ছিল কিনা এবং সেই প্রশ্ন আড়াল করার আগ্রহেই তাড়াহুড়া করে ঐসব কেচ্ছা প্রচার করা হয়েছিল কিনা তা এখনও কেউ অনুসন্ধান করেছেন কিনা জানি না। কিন্তু বাস্তবত, নৈতিক প্রশ্নে নিদারুণ লেজেগোবরে মাখামাখি করেই সরকার মুক্তি দিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেও যে মুক্তি দিতেই হবে, সেটাও স্পষ্ট। শিক্ষকদের দিকে অতি-মনোযোগ দিতে গিয়ে ঢাবি-রাবি'র শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং রাবি'র একজন ড্রাইভারের মুক্তির কথা সরকার যদি ভুলে যেতে চায়, তাহলে যে সমস্যা থেকেই যাবে, সে-কথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্যাতনবিরোধী-কর্তৃত্ববিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রতিদিনই মনে করিয়ে দিয়ে চলেছে।

তারপরও, মুক্তিদান আর মামলা চুকে যাওয়াতেই সব ফুরাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষা এবং শিক্ষার্থীদেরকে নির্যাতন করার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে টাকা ঢেলে ছাত্র খেপানো এবং সহিংসতায় মদদ জোগানোর মতো অলীক-আশ্চর্য অভিযোগ আনা এবং তাদেরকে গ্রেপ্তার-নির্যাতন-কারাভোগ করানোর নজিরবিহীন ঘটনা ঘটানোটা রাষ্ট্র-ব্যবসায়ীদের পক্ষে আদৌ সম্ভব হলো কীভাবে, সেটা তো আমাদেরকে বুঝতে হবে। সেজন্য বহুলনন্দিত আইনের শাসনের আসল অন্তঃসার, কর্তৃত্বপরায়ন রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী হয়ে ওঠার প্রবণতা এবং রাষ্ট্রীয়-কর্পোরেট যৌথ প্রচারণা-প্রকৌশলের ঐক্য ও টানাপোড়েন, এক কথায় জরুরী জমানার জরুরী বাক্‌ধারাসমূহ (ডিসকোর্স) বুঝে দেখার প্রয়াস জরুরী।

একেবারে প্রাথমিক অর্থে, আইনের শাসন মানে কিন্তু সবার জন্য ভালোভাবে খাওয়া-পরার, যার যার পছন্দমতো জীবিকা ও সৃষ্টিশীল কাজের এবং প্রত্যেক মানুষের অফুরন্ত সম্ভাবনার বিকাশের জন্য মানানসই মানবিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো গড়ে তোলা নয়; আর সামাজিক পরিসরে সমস্ত মানুষের ব্যক্তিগত ও যৌথ আত্মকর্তৃত্বের আকার-আয়োজনের প্রশ্ন তোলা তো শাসক সমাজের আলোকিত-দীপায়িত লোকদের কাছে নিতান্তই অবান্তর। আদতে আইনের শাসন কায়েম করা মানে হচ্ছে চির-মহান শাসকদের কথা শুনতে, তাঁদের নির্দেশিত পথে চলতে দেশের নাগরিকদেরকে বাধ্য করা এবং যাঁরা অবাধ্য হবেন তাঁদের ওপর বলপ্রয়োগ করার পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত কায়েম করা। উদ্দেশ্য, নিঃশর্তভাবে বিশ্বব্যাঙ্ক-আইএমএফের হুকুম মেনে চলার জন্য, তেল-গ্যাসের বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহ আর এন্টারটেইনমেন্ট-মিডিয়া-গ্ল্যামার-ইন্ডাস্ট্রির অবাধ লুণ্ঠন-বিচরণের ক্ষেত্র তথা বাজারের বিধিকে নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়ে গোলামির সংস্কৃতিকে প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, এবং বিশ্বজোড়া ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের দালালি করার জন্য জনসাধারণকে বাধ্য করার আইনসম্মত পরিবেশ প্রস্তুত করা। অস্ট্রেলিয়া থেকে বন্ধু বখতিয়ারের (রাবি'র নৃবিজ্ঞানের শিক্ষক) ইমেইল মোতাবেক, উন্নত দেশের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে 'নিও লিবারাল অ্যান্টিবায়োটিক'ও বলা যায়। এই ওষুধের প্রধানতম কাজ হচ্ছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, সত্যিকারের ভিন্নমত আর স্বাধীন চিন্তার ভাইরাসগুলোকে নির্মূল করা। তো, এই কাজ পুরোনো জমানার ঘুষখোর গরীব পুলিশবাহিনী আর দূরদৃষ্টিহীন দেউলিয়া রাজনীতিবিদদের দিয়ে বাংলাদেশে হচ্ছিল না। তাই বিধিসম্মত রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের কার্যকর বন্দোবস্ত বানানোর জরুরী প্রয়োজন হাজির হয়। এই প্রয়োজনের সপক্ষের প্রচার-প্রচারণা চলেছে গত দেড় যুগ ধরে, তথাকথিত সুশীল সমাজের বুদ্ধিজীবীবৃন্দ ও মিডিয়ার নিবিড় নিরলস সাহসী ও সৃষ্টিশীল পরিশ্রমের মাধ্যমে। ফলে, সামন্তযুগের ভুতের ঘাড়ে চড়ে ঘুরে-বেড়ানো গণবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলোর দেউলিয়াত্বের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের উপযুক্ত উপলক্ষ পাওয়া মাত্র আইন এবং রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সর্বাত্মক-স্বৈরাচারী একটা চেহারা নিতে শুরু করে। তার বলপ্রয়োগের সংস্থাগুলো আরও নিখুঁতভাবে নিপীড়ক হয়ে উঠতে থাকে। এই প্রক্রিয়াটিই জরুরী আইন নাম ধারণ করে ১১ই জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে সিংহাসনে আরোহন করে। বলে রাখা দরকার, ইতিহাসে দেখা গেছে, রাজশক্তিসমূহের বা শাসকগোষ্ঠীসমূহের বোঝাপড়া ভেঙে যাওয়া জনিত প্রতিটা মাৎস্যন্যায়ের পরই রাষ্ট্রের জুলুম-যন্ত্র তথা 'বিজয়ী' শাসকগোষ্ঠী আগের চাইতে বেশি কঠোর ও নিপীড়ক হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

আইনের বলপ্রয়োগ মানে প্রধানত আদালত-রিম্যান্ড-জেলজুলুম-ক্রসফায়ার-এনকাউন্টার এবং প্রকাশ্য দিবালোকে বা আধা-প্রকাশ্য রাত্রিলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে তথা যথোপযুক্ত লোকজনকে পুলিশ বা সামরিক-আধাসামরিক বাহিনী দিয়ে লাঠিপেটা করানো। একই সাথে 'মানুষকে প্রত্যাশিত সেবাদান হবে পুলিশের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি' (৮ জানুয়ারি ২০০৮-এ পুলিশ সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য) জাতীয় বক্তৃতা করাটাও আইনের সুশীল বাচনভঙ্গিরই আনুষ্ঠানিক অঙ্গ বটে। সরকারী বন্দুকধারী লোকজনের, মানে র‍্যাব-পুলিশ প্রভৃতি সংস্থার, বন্দুকের সেবাদান যে কতটা নির্মম ও ভয়ঙ্কর হতে পারে ভুক্তভোগী না হওয়া পর্যন্ত শাসক-পরিবারের সদস্যরা তা বুঝতে পারার মতো অনুভূতিশক্তির অধিকারী এখনও আছেন কি? নিপীড়ক রাষ্ট্রের পক্ষে বাম হাতে বন্দুক নিয়ে ডান হাতে সেবা দিতে যাওয়াটা যে নিতান্তই নির্মম ক্যারিকেচার সেটা বোঝা কি খুবই কঠিন? নিরস্ত্র জনগণের সামনে ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্রের অধিকারী একদল সংগঠিত মানুষ এসে যদি বলে আমরা তোমাদেরকে উদ্ধার করতে এসেছি, অভিজ্ঞতাটা তাহলে সুখকর হয় না। দেশী-বিদেশী ইতিহাস তা-ই বলে। বাস্তবে, বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহ আর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে বলপ্রয়োগের নানান সব বন্দোবস্ত সাবলীলভাবে চালু করতে পারলে আপনি কার্যকর রাষ্ট্র, আর আপনার সরকার সুশাসনের সরকার, না-পারলে আপনি ব্যর্থ রাষ্ট্র। আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জামাত-জাপা'র ক্যাডাররা মানুষ খুন করার বন্দোবস্ত গড়ে তুললে সেটা দুর্বৃত্তের শাসন, আর পুলিশ-র‍্যাব-কোবরা-চিতার রাষ্ট্রীয় 'ক্যাডার'দের মাধ্যমে বিনা বিচারে খুনের বন্দোবস্ত গড়ে তোলা হলে সেটা আইনের শাসন।

কিন্তু আইনের জোরে, জেলজুলুম-বন্দুকের জোরে 'অপরাধ' দমন করা যায় না। যে-দুর্নীতির কথা বলে জরুরী আইন জারি করা হয়েছে, জেল-জুলুম-হুকুমদারির সমস্ত হাতিয়ার ব্যবহার করেও সেই দুর্নীতিকে বাগে আনা যায় নি। দুর্নীতির প্রশ্নে সরকার প্রশ্নাতীত সুনীতির পরিচয়ও রাখতে পারে নি। অপছন্দের দুর্নীতিবাজকে ধরা হয়েছে, পছন্দের দুর্নীতিবাজকে বাইরে রাখা হয়েছে। উপদেষ্টাদের নিজেদেরই সম্পত্তির হিসাব দেওয়ার প্রশ্নটিকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। দুর্নীতিবাজদের তালিকা কাটাছাঁটা করতে হয়েছে, কাউকে কাউকে ছেড়ে দিতে হয়েছে, ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে আর কাউকে ধরা হবে না বলে কথা দিতে হয়েছে ... একেবারে নাকানিচুবানি অবস্থা। বলপ্রয়োগের বাড়াবাড়িতে উল্টা বাজার-হাট-দোকানপাট-আমদানি-রপ্তানি-ব্যবসা-বাণিজ্য-রাজনীতি-

প্রতিষ্ঠান ছারখার হয়ে গেছে। বোঝা গেছে, সমাজব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া দুর্নীতি দূর করা সম্ভব না। যে-গণতন্ত্রহীনতার কথা বলে জরুরী আইনের সরকার বসানো হয়েছে, সেই সরকারই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলে নি, পাঁচ উপদেষ্টার পদত্যাগের কোনো ব্যাখ্যা সরকার দেয় নি, যে-সেনাসদস্যটি ঢাবি-শিক্ষার্থীটিকে প্রহার করেছিল তার কী বিচার হলো জানা যায় নি, সেনা-হেফাজতে নিহত মধুপুরের আদিবাসী নেতা চলেশ রিছিলের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার খবর মিডিয়ায় ছাপানো যায় নি, আরও কত নিরাপরাধ মানুষ হয়রানি ও নিপীড়ণের শিকার হয়েছে তার কোনো হদিস নাই, স্বচ্ছতারও ব্যাপক অভাব থেকে গেছে, প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানের দ্বৈত ক্ষমতাকেন্দ্র কখনো কখনো দৃশ্যমানভাবে সমান্তরাল হয়ে উঠেছে, প্রশ্নও উঠেছে, সদুত্তর মেলে নি। পুরোনো যুগের হাসিনা-খালেদার মতোই প্রধান উপদেষ্টা দেদারসে ফিতা কেটেছেন, এটা-সেটা উদ্বোধন করেছেন, ক্যামেরা-ত্রাণ চালিয়েছেন। একই কাজ সেনাপ্রধানও চালিয়ে গেছেন, যাচ্ছেন সমানে। টিভি চ্যানেলগুলোকে দিয়ে উন্নতিমূলক প্রচারণা-ভিডিও চালানোও বাদ যায় নি। এ-রকম আরও অনেক দৃশ্য-কাঠামো সেই পুরোনো জমানার ছাঁচকে মনে করিয়ে দিয়েছে। মিডিয়া স্বাধীন থাকে নি। টেলিফোন অ্যাডভাইস, কর্তৃপক্ষ-আরোপিত সেন্সরশিপ এবং স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপের ঘটনা ঘটেছে অনেক, সাংবাদিকদের আটক করা হয়েছে, আটক করে নির্যাতন করা হয়েছে, মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে, কার্ফুর মধ্যে সাংবাদিকদের পরিচয়পত্র দেখে দেখে পেটানো হয়েছে। শিক্ষকদেরকে গ্রেপ্তার করার খবর পর্যন্ত পত্রিকায় এসেছে দু-আড়াই দিন পর, শিক্ষকদের মুক্তি দাবি করে মার্কিন সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডির বিবৃতি *প্রথম আলো*'য় ছাপা হয়েছে টিভিতে প্রচারেরও সপ্তাহখানেক পর। সেন্সরশিপ যে হচ্ছে মিডিয়া সে-কথা ঠিকমতো প্রকাশ পর্যন্ত করতে পারে নি, কিংবা ইচ্ছা করে নি। ভয় যেমন ছিল, তেমনি এই সরকারের সাথে মহাজনী মিডিয়ার স্বার্থ ও এজেন্ডার শ্রেণীগত ঐক্যও ছিল। ভেতরে ভেতরে দেনদরবার সত্ত্বেও সেই ঐক্যে বেশিরভাগ সময় কাজ হয় নি। রাষ্ট্রশক্তি যখন সর্বাত্মক দমনমূলক চেহারা নিতে থাকে তখন সে তার শ্রেণীর লোকদেরকেও শিকারে পরিণত করতে পারে। বহুলকথিত শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র মানে যেমন প্রত্যেক শ্রমিকের রাষ্ট্র না, বিরলকথিত বুর্জোয়া রাষ্ট্র মানেও তেমনি প্রত্যেক বড়লোকের রাষ্ট্র না। কর্তৃত্বপরায়ন আমলাতান্ত্রিক কাঠামোসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের খোদ পরিচালকবর্গ বা ম্যানেজার-গোষ্ঠী যেকোনো শ্রেণী-গোষ্ঠী-দল-ধর্ম-জাতির জন্য নিপীড়ক হয়ে উঠতে পারে। প্রসঙ্গত, এটা এমন এক সত্য ইতিহাসে যার বহু প্রমাণ আছে, অথচ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, বুর্জোয়া উদারনীতিবাদী এবং অন্যান্য কর্তৃত্বপরায়ন দলগোষ্ঠীগুলো তা উপলব্ধি করে নি বললেই চলে। এইজন্য, শুধু ভালো মানুষদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিলেই রাষ্ট্র ভালো হয়ে যায় না, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বপরায়ন কাঠামোর একেবারে আমূল পরিবর্তন ছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া সত্যিকারের গণমুখীনতা অর্জন করতে পারে না।

জনগণের স্বাধীনতার পরিসর বাড়াতে গেলে অনিবার্যভাবে তাই আসে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক শক্তিকে ক্রমশ দুর্বল করার প্রশ্ন, এবং জনগণের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সমাজ-সঙ্ঘ-শক্তিকে ক্রমাগতভাবে প্রসারিত করার এ-যাবৎ অনালোচিত প্রশ্ন। কেননা, জরুরী হোক আর শিথিল হোক অল্পকিছু লোকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলেই স্বৈরতন্ত্রী জুলুমের আশঙ্কা দেখা দেয়। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কিনা বলা মুশকিল, কিন্তু সুন্দর নাম দিয়ে শাসন-নিপীড়ণের বাস্তবতা ঢাকা যায় না। খেয়াল করা জরুরী যে, আইনের শাসন মানেও কিন্তু ঐ শাসন-ই। সুশাসকও শাসক, দুঃশাসকও শাসক। বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক এবং সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান দুটিতে, শাসন মানে হলো 'দমন', 'নিগ্রহ', 'অত্যাচার', 'তিরস্কার', 'শাস্তিদান', 'ভর্ৎসনা', 'নির্দেশ', 'আজ্ঞা', 'বিধি' ইত্যাদি। 'সুব্যবস্থার সাথে প্রতিপালন' বা 'পরিচালনা' জাতীয় দুই-একটা কথাও অভিধানে (এবং শাসকদের লোকশোনানো বুলিতে) আছে বটে। কিন্তু কে না জানে, কোনো শাসকই বলে না যে আমি তোমাদের দমন এবং অত্যাচার করার জন্য এসেছি, সুতরাং বাঁচতে চাইলে সুবোধ বালকের মতো 'একান্ত বাধ্যানুগত' থাকতে হবে। (ঔপনিবেশিক ধাঁচের আবেদনপত্রগুলোর 'ইতি আপনার একান্ত বাধ্যানুগত' জাতীয় শব্দরাজি স্মরণ করে দেখুন।) সবাই বরঞ্চ 'সুব্যবস্থার সাথে প্রতিপালন' তথা 'সুশাসনের' বুলিই শোনায়, কিন্তু বাস্তবে যা করে তার নাম শাসন। আসলে হাজার বছরের নিরলস চেষ্টায় গানে-কবিতায়-শাস্ত্রে-নিপীড়ণে শাসনের ধারণাটিকে পরাজিত মানুষের অভ্যাসের মজ্জায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'শাসন করা তারই সাজে আদর করে যে', 'পেটে খেলে পিঠে সয়', 'ভাত দেওয়ার ভাতার না, কিল মারার গোঁসাই' এইসব আদতে বস্তাপচা কিন্তু দাসত্ব-মনোবিকারগ্রস্তদের দ্বারা অভিনন্দিত প্রবাদ-প্রবচন শাসনের সুপ্রাচীন ধারণার অনুমোদন দেয়। এক অর্থে, পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস তো একদিকে কেন্দ্রীভূত শাসন-কর্তৃত্ব, অন্যদিকে গণদাসত্বের ইতিহাসও বটে। এই ইতিহাস জুড়ে আপাত বিচারে কর্তৃত্বেরই জয়জয়কার হয়েছে। ফলে শাসকশ্রেণী দিবারাত্রি যখন আইনের শাসনের বুলি প্রচার করে তখন খুব কম লোকেরই খটকা লাগে, সব প্রচারণাই মনে হয় স্বাভাবিক। ফলত, পদ্মা নদী এবং তার পরিপার্শ্বস্থ নিসর্গে ঢাকা বিশাল জেলখানা দেখেও কারও খটকা লাগে না, মনে হয় যেন পদ্মা নদীর মতোই এটাও কোনো প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান। এটা দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণ তথা শাসক শ্রেণীর দীক্ষায়ণ প্রকৌশলের পরিণাম।

কিন্তু মানুষের ইতিহাস আদতে প্রতিরোধের ইতিহাসও বটে। বোধগম্য কারণে সেই ইতিহাস খুব একটা রচিতও হয় নি, প্রচারিতও হয় নি। অনেক ন্যায্য কারণে মহা-প্রশংসিত *বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব* গ্রন্থেও দেখবেন জেলজুলুম-কয়েদ-কারাগার-নিপীড়ণ-নির্যাতন-পরাধীনতা এবং সেসবের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধের ইতিহাস নিয়ে কোনো কথা নাই বললেই চলে, এ-বিষয়ে আলাদা একটা অধ্যায় থাকা তো নিছক কষ্ট-কল্পনা। তথাচ মানুষের নিরন্তর প্রতিরোধ জারি আছে। সেগুলোকে বিদ্রোহ নামে ডাকা হয় না, যেন সেগুলো 'আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি' মাত্র। গত এক বছরের জরুরী অবস্থায় দমবন্ধ-করা মহামান্য ভয়ের রাজত্বেও কৃষকেরা শ্রমিকেরা গার্মেন্টস-কর্মীরা ছাত্রেরা শিক্ষকেরা প্রতিরোধ-আন্দোলনের আগুনে স্বাধীনতার শিখা সমুন্নত রেখেছেন। মানুষের অন্তরাত্মা এই শিক্ষা কখনও ভোলে নি, মুখে যদিও সকলে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার বুলিই আওড়ায়, তবু 'যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ'। মানুষের যৌথ-স্মৃতিতে রাবণ-রাক্ষসের রাজ-নীতি এখনও বহাল আছে। লেনিনের অনেক আগেকার রুশ বিপ্লবী বাকুনিনও ১৮৭০ সালে এই কথাই বলেছিলেন: "সবচেয়ে র‍্যাডিক্যাল বিপ্লবীটিকে আনুন এবং তাকে নিখিল রাশিয়ার সিংহাসনে বসিয়ে দিন অথবা তাঁকে একনায়কের ক্ষমতা দিয়ে দিন এবং এক বছর পার হওয়ার আগেই তিনি খোদ জারের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে পড়বেন" (নোম চমস্কি, ১৯৭০)। বলশেভিকদের ইতিহাস বাকুনিনকে অভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে।

ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালো মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আপনি যদি মানুষকে সেই 'শাসন'ই করতে চান, আপনার রাষ্ট্র-পরিচালন-কাঠামোটা যদি উচ্চ-নিচ ধারার কর্তৃত্ব-ক্রমতান্ত্রিক এবং আমলাতান্ত্রিকই হয় এবং রাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষমতা যদি অল্প কয়েকজনের হাতেই কেন্দ্রীভূত থাকে, তাহলে মানুষের দুর্ভোগ এড়ানোর উপায় থাকে না। এ-রকম 'গণতন্ত্রের' বুদ্ধি-ঠাসা মাথায় স্বৈরতন্ত্রীর শিঙ গজাবেই। মহামতি লেনিন বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো শ্রেষ্ঠ নেতাকেও আমরা সাংঘাতিক স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে দেখেছি এবং সেটাই ছিল স্বাভাবিক। আমাদের এই এক বছরের জরুরী জমানাতেও আমরা কখনো কখনো জারের ছায়া দেখতে পেয়েছি। লেনিনের চেকা, হিটলারের গেস্টাপো, শাহের সাভাক বাহিনীর সুদূরবর্তী নিশানাও এখানে-সেখানে অগোচর থাকে নি। তদুপরি সেই যুগ আর নাই। সেকালের গুপ্ত খুনের বদলে এখন এসেছে প্রকাশ্য রাষ্ট্রীয় খুনের যুগ। রাষ্ট্র এখন তার অপছন্দের নাগরিকদের চাইলে খুন করে, চাইলে হাতে-পায়ে নল ঠেকিয়ে গুলি করে পঙ্গু বানিয়ে পত্রিকায় খবর পাঠায়, টিভি-ক্যামেরা ডেকে পাঠায়। সম্ভাব্য প্রতিবাদীদের জন্যে, স্বাধীন মানবাত্মার জন্যে বার্তা ঘোষিত হয়: বুদ্ধিমানের জন্য বন্দুকের ইশারাই যথেষ্ট। আর, আমাদের ভাই-বন্ধুদেরকেই কিন্তু অপরাধী দমনের মতাদর্শ খাড়া করে রাষ্ট্রীয় নিধনযজ্ঞে নিয়োজিত করা হচ্ছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় রাষ্ট্রটিই কিন্তু বিনাবিচারে মানুষ খুন করার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার এবং অকল্পনীয় নির্যাতন-নিপীড়ণের মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা করার চাকুরিতে নিয়োগ করেছে আমাদেরই দেশের সৎ ও দেশপ্রেমিক অফিসারদেরকে। থানা মানে জুলুম-কেন্দ্র। র‍্যাবের অফিস মানে নির্যাতন-কেন্দ্র। সারা বাংলাদেশকে টর্চার-চেম্বার বানিয়ে ফেললে কি দেশটা স্বর্গ হয়ে যাবে? এই সাধারণ সত্য প্রশ্নটা তোলার মতো বুদ্ধিজীবীর দেখা মিলছে না। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ণের মতাদর্শ মিডিয়া এবং শিক্ষিত সমাজ গিলছেন এবং প্রচার করছেন। খোদ খুনের চেয়ে খুনের মতাদর্শ বেশি ভয়ঙ্কর। অত্যাচারের চেয়ে অত্যাচারের বৈধতা আরও বেশি বিপজ্জনক। বলপ্রয়োগ করে মানুষের মঙ্গল করা যায় না, সে কথা কে না জানেন? মনুষ্যত্ব-বিণাশী জল্লাদের চাকুরি থেকে আমাদের ভাই-বেরাদর-সন্তান-বান্ধবদেরকে অব্যাহতি দানের ব্যবস্থা করার প্রশ্ন তোলাটাও আমাদের বৃহত্তর পারিবারিক কর্তব্যই বটে।

নীতি-নির্ধারক যে-ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রকে জালেম বানিয়ে তোলেন, তাদের রক্তমাংসের মুখ আড়াল করার জন্য জারের শাসন বা ফুয়েরারের শাসন বলে অভিহিত না-করে

আজকের শাসকেরা নিজেদের কর্মকাণ্ডকে বলে থাকেন আইনের শাসন। অব্যাহতিপ্রাপ্ত বড় বড় চোখওয়ালা এক উপদেষ্টার মতোন প্রতিদিন মানুষকে তাঁরা ধমকান আর বলতে থাকেন, 'আইন তার নিজ গতিতে চলবে'। কিন্তু আইনের নিজের গতি মানে যে কর্তা-শাসকদের মতিগতি মাত্র সে-কথা এই যুগের পাগল এবং শিশুদেরও না বোঝার কথা না। আমাদের, বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের, নিষ্পাপ শিশু-সন্তানেরা কিন্তু প্রতি সপ্তাহে একদিন করে জেলে ঢুকেছে তাদের বন্দী পিতাদের দেখার জন্য। জেলখানা চিনে এসেছে পুষ্পসম লালন আর গার্গি। তারা ঠিক করেছে, বড় হয়ে তারা সকলকে বুঝিয়ে বলবে যে, সমাজে জেলখানার আসলে দরকার নেই। কেননা মানুষকে বন্দী করে রাখার মতো পাপ আর নেই। শাসকশ্রেণীর পাঁচ হাজার বছরের কর্তৃত্ববাদী সভ্যতার পাপের ফলে সৃষ্ট ক্ষতগুলো লুকানোর জন্যই বারো হাত তেরো হাত উঁচু ঐসব একটানা দেওয়াল রচনা করা হয়েছে। ঐসব দেওয়ালেরও নাম হয় আইনের শাসন।

সুতরাং, ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেওয়াটা অতীব দরকারী হলেও, তার চেয়েও জরুরী প্রশ্নটা হলো, অতীতের মতোই, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কখনো জরুরী কখনো 'স্বাভাবিক' আইনের স্টিম রোলার যদি চলতেই থাকে তাহলে কেউ না কেউ তার তলায় পিষ্ট হতেই থাকবে। এটাই কিন্তু নীতিগত বিচারে গোড়ার প্রশ্ন। মানুষকে বন্দী করে রাখার কোনো অধিকার আদৌ কি কোনো শাসক বা শাসনতন্ত্রের আছে? জেলখানায় আমি অনেক নিরাপরাধ মানুষ দেখে এসেছি, কেউ কখনো যাদের মুক্তি দাবি ক'রে পত্রিকায় লেখে নি, লিখবে না। অথচ তাঁরা আমাদের মুক্তির জন্য আন্তরিকভাবে উৎকণ্ঠিত থেকেছে, দোয়া করেছে। তাঁদের কী হবে? দমনমূলক রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ, কারাগার, আইনের শাসনের বিদ্যমান মৌলিক কর্মপ্রক্রিয়া ও নীতি-পদ্ধতিগুলোকে আমাদের বিদ্বৎসমাজ যদি এটা-ওটা অজুহাতে সঠিক বলে অনুমোদন করেন, তাহলে তাদেরকে এ-কথাও মানতে হবে যে, শিক্ষক-ছাত্রদের কয়েদ-খাটা ঠিকই আছে। অসংখ্য নিরাপরাধ লোক (যাদের মধ্যে স্কুল-কলেজের শিক্ষকও আছেন) যদি দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ বছর জেল খাটতে পারেন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পারবেন না কেন? আর এই বিদ্বৎসমাজ যদি মনে করে থাকেন, সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক বা শিক্ষিত এলিট লোকদের মূল্য বেশি, তাহলে সেটা গণতান্ত্রিক সম-চেতনার করুণ কন্ট্রাডিকশনকে চিত্রায়িত করবে। আমাদেরকে তার মানে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বিদ্যমান আইনের শাসনের খোদ প্রক্রিয়াটিকেই প্রশ্ন করতে হবে। জনগণের সৃজনশীল মনুষ্য-গুণাবলীর স্বাধীন বিকাশ ও আত্মকর্তৃত্বের সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলার কথা ভাবতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেক ও চিন্তা-প্রকাশের স্বাধীনতা যারা প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁরা কেমন করে বিস্মৃত হবেন যে, বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি কাঠামোগত প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়ণ থেকে মুক্ত না-হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে না? লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তন-প্রক্রিয়া ও প্রকৃতির সাথে লেনদেন থেকে অর্জন করা বিবেক, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সংহতি, ভালোবাসা ও বিশ্বাসের পথে চলতে গেলে আপনাকেও হয়ত কারাগারে যেতে হবে। নিপীড়ক রাষ্ট্র-শাসকরা আপনাকে সহ্য করবে না। তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বাধীনতার বেশ খানিকটা বিধান করেছিল। তবু শিক্ষকেরা স্বাধীন হন নি; একদিকে পদ-প্রমোশন-হালুয়া-রুটির লোভে এবং অন্যদিকে রাষ্ট্র-রাজনীতির বলপ্রয়োগের ভয়ে। রাষ্ট্রের সুদীর্ঘ শুঁড় ঢুকে তছনছ করে দিয়েছে স্বায়ত্তশাসনের ধারণা ও অনুশীলন। আসলে আইন করে কাউকে স্বাধীন বানানো যায় না। বাজারে রূপান্তরিত হওয়া আজকের সমাজের প্রচুর মানুষ ঐ লোভ আর ভয়ের তাড়ণাতেই স্বাধীনতা তথা মনুষ্যত্বকে একটু একটু করে হারিয়ে ফেলছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে-বাহিরে ভয় আর লোভের চোখে চোখ রেখেই আমাদেরকে স্বাধীন হয়ে উঠতে হবে। রাজনৈতিক দলীয় ও প্রাইভেট অস্ত্রধারী বাহিনী, রাষ্ট্রীয় রক্তচক্ষু এবং সরকারী বন্দুকধারীদের হুকুমকে চ্যালেঞ্জ করে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকেরা এবং বুদ্ধিজীবীরা যদি চিন্তা-বিবেক-প্রকাশের স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব পাহারা দিয়ে রাখতে পারতেন, তাহলে আজ বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজের এই হাল হতো না।

আমরা কি রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ, কারাগার এবং জুলুমের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে একটা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার আলোচনা শুরু করতে পারি না? কারাগারের পেট থেকে বের হয়ে আসার পর এ-কথা আমাদের ভুলে যাওয়ার উপায় নাই যে, বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠান থাকলে কিন্তু কারো না কারো ওপর বলপ্রয়োগ করা হবেই। তাতে চলেশ রিছিলদের মৃত্যু হবে। কারাগার থাকলে কিছু লোককে সেখানে ঢোকানো হবেই। বলপ্রয়োগের কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র ও কারাগার ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র একটা রাষ্ট্র সত্যিকারের সুশীল রাষ্ট্র হতে পারে। বলপ্রয়োগ করে, গায়ের জোরে, লাঠির জোরে, বন্দুকের জোরে শুভ-মঙ্গল-কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মানুষকে বন্দী করে তার 'অপরাধ' সংশোধন করা যায় না, বন্দী করে মানুষকে স্রেফ নিঃস্ব ও ধ্বংসই করা যায়।

মানুষ তবু ধ্বংস হয় না। তার আত্মার ভেতরে আছে সৃষ্টিকর্তার আলো। জন্মসূত্রে মানুষ স্বাধীন। রুশো তাঁর *ডিসকোর্স অন ইনইকুয়ালিটি* (১৭৫৫) গ্রন্থে বলেছিলেন, "মানুষের মৌলিক ও নির্ধারক ধর্ম হচ্ছে তার স্বাধীনতা। দাসত্বের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁককে যাঁরা মানুষের ধর্ম বলে চালাতে চান, তাঁরা ভেবে দেখেন না যে, স্বাধীনতা এবং নিষ্পাপতা ও সৎকর্মের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁকও মানুষের ধর্ম।" (নোম চমস্কি, ১৯৭০) স্বাধীনতাই সৃজনশীলতার ধাত্রী। আর, স্বাধীনতা আসে শুধু স্বাধীনতারই পথে। কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই স্বাধীনতার সূচনা ঘটায়। দ্রোহ ও সংগ্রামের পথে আসে সংহতি। উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তার পাহারাদার সশস্ত্র কর্তৃত্বের হাজার হাজার বছরের নিষ্পেষণে মানুষ তার হারিয়ে ফেলা বিবেক, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সংহতি, ভালোবাসা, বিশ্বাস তথা মনুষ্যত্বকে মানুষ ফিরে পায় সংগ্রাম-সংহতি-স্বাধীনতার পথে। প্রতিটা বিদ্রোহ আর সামাজিক আন্দোলন মানুষের মধ্যে শ্রেয়োচেতনা, উন্নত নীতিবোধ, হিতাকাঙ্ক্ষা আর সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের জন্ম দেয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২০০৭ সালের আগস্ট-বিদ্রোহ এই প্রশ্নগুলোকেই সামনে টেনে আনলে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের পথে এগিয়ে যেতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১২ই জানুয়ারি ২০০৮

হদিস

নোম চমস্কি (১৯৭০), "ভবিষ্যতের সরকার", নিউ ইয়র্কের যুবক-যুবতীদের হিব্রু সমিতি'র কবিতা-কেন্দ্রে ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত শ্রুতি-সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা, মূল অডিও: www.chomsky.info/audionvideo/ 19700216.mp3, বক্তৃতাটির ইংরেজি অনুলিখন: http://tangibleinfo.blogspot.com/2006/11/noam-chomsky-lecture-from-1970-full.html, বঙ্গানুবাদ: সেলিম রেজা নিউটন, মানুষ নেটওয়ার্ক কর্তৃক অচিরেই প্রকাশিতব্য (www.manooshnetwork.org)।

লেখক পরিচিতি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক সভাপতি এবং মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ক পত্রিকা *মানুষ*-এর সম্পাদক।

কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার স্ব-দায়িত্ব

পার্থ প্রতীম দাস

২০০৭ সালের ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাসদস্য কর্তৃক শিক্ষার্থী নির্যাতনের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নামে অনেকগুলো মামলা দেয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করে, কারাদণ্ড দেয়। নানান উপায়ে কর্তৃত্ব কায়েমের মাঝ দিয়ে সরকার ভেবেছিল তারা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের চুপ করিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু মানুষের ধর্ম এটা না। মানুষ কখনো কর্তৃত্বের সামনে মাথা নোয়াতে চায় না। এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী বলে না, কোনো মানুষই চায় না যে, তার উপরে কর্তৃত্ব করা হোক। এবং কর্তৃত্ব করা হলে সে প্রতিবাদ করে, প্রতিবাদ করতে না পারলেও মনে মনে ঘৃণা করে সেই কর্তৃত্বকে। মানুষ আসলে স্বাধীনতা চায়, স্বাধীনতার সীমা যতোটা পারে প্রসারিত করতে চায়। ইতিহাস এমনটাই সাক্ষ্য দেয়। রাষ্ট্র যে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য কতোটা ভয়াল আকার ধারণ করতে পারে এবং সেই সাথে সাথে জনগণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের তেজদীপ্ত প্রজ্জ্বলিত শিখায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়— সেটা আগেও আমরা অনেকবার দেখেছি। সাম্প্রতিক সময়েই দেখেছি কানসাটে, ফুলবাড়িতে, শনির আখড়ায়, গার্মেন্টস শ্রমিকদের, পাটকল শ্রমিকদের, আরো অনেক জায়গায় সারের দাবিতে কৃষকদের। মানুষ বুলেটের সামনে বুক পেতে দিতেও দ্বিধা করে নি। তারা চরমভাবে নিপীড়িত হয়েছে, তবু তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জায়গা থেকে এক চুলও সরে আসেনি। এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র নিপীড়ণ করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে মাথা নোয়াতে হয়েছে প্রতিবাদী জনগণের সামনে। এই একই ব্যাপার আরেকবার খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ মিললো আমাদের, ২০ আগস্টের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে। এটা আমাদেরকে কোনো তত্ত্ব বা মতাদর্শ দিয়ে 'বুদ্ধি খাটিয়ে' দেখতে হয় নি। বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এই জিনিসটা জেনেছি আমরা।

২০০৭ সালের ২০ আগস্ট সেনাসদস্য দ্বারা যখন একজন শিক্ষার্থী লাঞ্ছিত হলো, তখন ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এর প্রতিবাদ করেছিল। এতে কারো কোনো ইন্ধন বা প্ররোচণা ছিল না— এটা তো প্রমাণিত হয়েই গেছে। শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ না করলেই বরং প্রশ্ন তোলাটা সংগত ছিল যে, প্রতিবাদ করে নি কেন? রাষ্টমালিকরা কী তাহলে এরকম চায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন শিক্ষা দেয়া হোক যেন শিক্ষার্থীরা সব মুখ বুজে সহ্য

করে, অপমানিত, নির্যাতিত হয়েও কিছু না বলে? শিক্ষার্থীরা সবসময় দাসসুলভ আচরণ করুক— এমনটাই কী চান তারা? তাহলে আবার মুখে বলেন কেন যে, "এরা দেশ চালাবে", "এরা জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে" ইত্যাদি প্রভৃতি? দাস হয়ে, গোলাম হয়ে জাতির জন্য কল্যান বয়ে আনবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা? ইতিহাস তো তা বলে না। বরং যখনই তারা প্রতিবাদ করার স্পর্ধা দেখিয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো জন্য রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করেছে, তখনই জাতির জন্য কল্যাণকর কিছু করা সম্ভব হয়েছে। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন থেকে তো আমরা সেই শিক্ষাই পেয়েছি। বর্তমান এই সুশীল তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেইসব ইতিহাসের ধার ধারে নি। এটা শুধু এই সরকার বলে কথা না, সব সরকার তথা রাষ্টমালিকদের চরিত্রই এইটা যে, সে ন্যায্য না অন্যায্য, যৌক্তিক না অযৌক্তিক— এসবের ধার ধারে না। প্রতিবাদ হয়েছে মানেই সেটা দমন করতে হবে— এই হলো ক্ষমতার, কর্তৃত্বের মূল কথা। এবারও তাই দেখলাম আমরা। আগস্ট বিক্ষোভের পর রাষ্ট্রের যতো ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী আছে, পুলিশবাহিনী, র‍্যাববাহিনী, সেনাবাহিনী, সবাই মিলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ণ শুরু করলো। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জেলে পুরলো, রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করলো, বিচারের প্রহসন করে কাউকে বেকসুর খালাস, কাউকে সাজা দিল। কিন্তু রাষ্ট্রের এহেন দমন-পীড়ণ জনগণের প্রতিবাদের প্রজ্জ্বলিত শিখার সামনে বরাবরের মতো এবারও জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত রাষ্ট্র মাথা নত করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে কারাবন্দী সব শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে মুক্তি দিল, মামলা প্রত্যাহার করে নিল।

সাজাপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মুক্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এমন একটা ভাব করলো যেন তারা দয়া করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মুক্তি দিল। রাষ্ট্রপতি 'মহানুভবতা'র পরিচয় দিয়ে 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করলেন। কিন্তু বাস্তবে তো ঘটনা তা না। সত্যি কথাটা হলো, রাষ্ট্রমালিকরা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের আগুন সহ্য করতে পারছিলেন না। তাদের গায়ে ফোস্কা পড়ছিল। রাষ্ট্রের হর্তা-কর্তারা কখনোই এতো বিবেকবান, এতো মহানুভব না যে, তারা তাদের ভুল স্বীকার করবে। তারা সবসময়ই নিরঙ্কুশভাবে বলপ্রয়োগ করে, ক্ষমতা প্রদর্শন করে। তারা বলে যে, আমরা দেশের, মানুষের ভালোর জন্য বলপ্রয়োগ করছি। কিন্তু যখন দেখি যে, সারের দাবিতে বিক্ষোভ করার জন্য কৃষকের বিরুদ্ধে জরুরী আইন ভঙ্গের মামলা দেয়া হয়, বেতন-ভাতার জন্য আন্দোলনরত শ্রমিকদের লাঠিপেটা করা হয়- তখন কীভাবে একথা মেনে নেব যে, তারা মানুষের ভালোর জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন? রাষ্ট্র-ক্ষমতায় যেই থাকুক না কেন, তারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজেদের কর্তৃত্বকে বজায় রাখতে— এটা সবাই পরিস্কার বুঝে গেছে। তো, তারা যখন আর কোনভাবেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জেলে পুরে রাখতে পারছিল না, তখন তারা একটা বিভ্রান্তি ছড়ানো চেষ্টা করলো, এরকম প্রচার চালিয়ে যে, "যাও, তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম"। কিন্তু এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়ে ক্ষমা করা হয় নি। শিক্ষকদেরকে বারবার সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, আপনারা মার্সি পিটিশন দেন, ক্ষমা চান। কিন্তু শিক্ষকরা কখনোই এটা করেন নি। বরং তারা বারবার বলেছেন যে, "আমরা তো কোনো অপরাধ করি নি। কাজেই ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না।" তারা যদি চেষ্টা করতেন, ক্ষমা চাইতেন তাহলে অনেক আগেই মুক্তি পেতেন। তাদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া হয়েছে আন্দোলন, প্রতিবাদের চাপে। এখানে 'সাধারণ ক্ষমা' একটা আইনি প্রক্রিয়া মাত্র। সাজাপ্রাপ্ত কাউকে মুক্তি দিতে গেলে রাষ্ট্রকে এই আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যেতে হয়।

সরকার যদি সত্যিই ক্ষমাশীল, মহানুভব হতো তাহলে আগস্ট বিক্ষোভের ঘটনায় ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলোও একই সাথে প্রত্যাহার করে নিত। কিন্তু সেটা তো তারা করে নি। ঢাকা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছিল বলেই এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মুক্তি পেয়েছে বা তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলো প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। কিন্তু অনান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন সিলেট শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে নতুন করে তাদের দাবির কথা বলতে হয়েছে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সরকারের কানে আওয়াজ না পৌঁছালে তাদের ঘুম ভাঙ্গে না। প্রতিবাদের আগুনে তাদের দগ্ধ না করলে তারা নড়চড় করে না। ক্ষমা তো অনেক দূরের কথা। সরকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সম্মান বজায় রাখতে গিয়ে 'সাধারণ ক্ষমা' নামের এই নাটকটা মঞ্চস্থ করে নিজেদেরকে খুব হাস্যকর বানিয়ে ফেলেছে।

আগস্ট বিক্ষোভের ঘটনা থেকে আরেকটা জিনিসও আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। সেটা হলো, আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার সীমা কীভাবে প্রসারিত হয়। ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারী জরুরী অবস্থা জারির কিছুদিন পর থেকেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, আলোচনা সভা, সেমিনার এগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যেখানে রাত ১০টা, ১১টা পর্যন্ত অবাধে ঘোরাফেরা করতো, সেখানে সন্ধ্যে ৭টার পর থেকেই তাদেরকে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়। মেয়েদের হলে ঢুকতে দেরি হলে পুলিশ গালাগালি পর্যন্ত করেছে। সাংস্কৃতিক সংগঠনের ছেলেমেয়েরা গ্রুপে কাজ শেষ করে গান গাইতে গাইতে ক্যাম্পাস থেকে বের হওয়ার সময় পুলিশ তাদেরকে গান বন্ধ করার হুকুম দিয়েছে। এমনকি বন্যার সময় ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়েও পুলিশি বাধার মুখে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, আর কিছুদিন পরে তারা হয়তো শিক্ষার্থীদের হাঁটাচলা, বেশবাস, পোশাকআসাক নিয়েও প্রশ্ন তোলা শুরু করতো যে, "এভাবে হাঁটছো কেন, ঠিক হয়ে হাঁটো" বা "চুল বড় রেখেছ কেন, কেটে ফেল" ইত্যাদি। এরকম পরিস্থিতিতে ২০০৮ এর শুরুতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা যখন *কর্তৃত্ব-বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ*— মঞ্চের আহ্বানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করা শুরু করলো তখন চাপ প্রয়োগ করনেওয়ালারা নিজেরাই চাপ অনুভব করতে থাকলেন। এসময় শিক্ষার্থীরা মাইক ব্যবহার করেছে, আলোচনা সভা করেছে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে, সভা-সমাবেশ করেছে। এবং কোনোটার জন্যেই কোনো অনুমতির প্রয়োজন পড়ে নি। কেউ এসে বলেও নি যে, এটা করা যাবে না। ২১ জানুয়ারী *কর্তৃত্ব-বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ* মঞ্চের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা আলোচনা সভা-সেমিনার করার জন্য কারো কাছে কোনোরকম অনুমতি না নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এরপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আবার অনুমতি দেয়া শুরু করে। এতদিন তাদের কাছে অনুমতি চাইতে গেলে তারা জেলা প্রশাসক, পুলিশ কমিশনার ইত্যাদি নানান ধরণের হাইকোর্ট দেখাতো। এখন আর কিছুরই প্রয়োজন পড়ছে না। পুলিশও আর কোনোরকম খবরদারি-হুকুমদারি করছে না।

তার মানে কিন্তু এই না যে, এরা সবাই ঠেলা খেয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ক্ষমতার চরিত্র কখনো বদলায় না। তারা এখন চুপ করে আছে কারণ শিক্ষার্থীরা এখনো ক্যাম্পাসে সক্রিয় আছে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, যে স্বাধীনতাটুকু আমাদের বেড়েছে— সেটা এমনি এমনি থাকবে না। এটা আমাদের ধরে রাখতে হবে। আবার যদি আমরা চুপ হয়ে যাই, নিষ্ক্রিয় হয়ে যাই, তাহলে আবার রাষ্ট্র, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমাদের ঘাড়ে চেপে বসবে। আমাদের দিকে চোখ রাঙ্গাবে। আমাদেরকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকে সবসময় তৎপর থাকতে হবে। কেউ কোনো রকম কর্তৃত্ব আরোপ করতে আসলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করতে হবে।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি জনগণের টাকায়। যার প্রায় পুরোটাই হলো কৃষক-শ্রমিকের প্রত্যক্ষ শ্রমের ফসল। এদের কাছে আমাদের দায় অপরিসীম। আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পাই, তাদের উপরে দায়িত্ব বর্তায় মানুষের জন্য, সমাজের জন্য কিছু করার। এ দায় আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমাদেরকে ভাবতে হবে কোন পথে এ ঋণ শোধ করা যায়। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের মুক্তবুদ্ধি, মুক্তজ্ঞানের চর্চা করার পরিবেশ থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্যান্টর্নমেন্ট বানালে, সবসময় রাষ্ট্রীয় নজরদারির মধ্যে রাখলে এই মুক্তজ্ঞান চর্চা সম্ভব না। রাষ্ট্রের হুকুমদারির খপ্পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে অবশ্যই বাঁচাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেও যেসব খবরদারি-হুকুমদারির ক্ষেত্র আছে, সেগুলোর সাথেও আমাদের লড়াই জারি রাখতে হবে। সেই সাথে সাথে আমাদের বিদ্যায়তনিক যে মহাজনী জ্ঞানকাণ্ড, যেগুলো সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্য বজায় রাখার, কর্তৃত্ব আরোপ করার, বলপ্রয়োগ করার মতাদর্শিক বৈধতা প্রদান করে— সেগুলোর বিরুদ্ধেও প্রশ্ন তুলতে হবে। এই প্রশ্ন তোলাটা এখন খুব জরুরী যে, ঐ জ্ঞান তো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কোনো কাজেই আসে না, তাহলে সেটা শিখে আমরা কী করব? বরং জনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন— সেই জ্ঞান আমরা সৃজন করব।

আগস্ট বিক্ষোভের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধের প্রশ্নে, স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার প্রশ্নে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বহুদিন পরে তরঙ্গিত হয়েছে। এ তরঙ্গ স্থিমিত হতে দেয়া যাবে না। বরং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে এক একটি ঢেউ হিসেবে সামিল হতে হবে এ তরঙ্গে।

১৬.০২.০৮, রা.বি

লেখক পরিচিতি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং ছোটকাগজ *স্বাধীনতাপত্র*'র সম্পাদক।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন: জরুরী পর্বের একটি জরুরী পাঠ ও বিবেচনা

আরিফ রেজা মাহমুদ টিটো ও পার্থ প্রতীম দাসের মধ্যে সওয়াল-জবাব

প্রাককথন: আগস্ট বিক্ষোভ ও পরবর্তীতে কারাবন্দী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মুক্তিকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার তাৎপর্য, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নিয়ে একটা কাজ খুব করে করতে চেয়েছিলাম। একবার উদ্যোগও নিয়েছিলাম। সেসময় আরিফ রেজা মাহমুদ টিটোকে বলেছিলাম আন্দোলনের সাংগঠনিক দিক নিয়ে একটা লেখা করে দিতে। টিটো রাজি হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেটা আর করা হয়ে ওঠেনি। এইবার *ওঙ্কার*-এর *মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন: জরুরী পর্ব* সংখ্যা বের হচ্ছে জেনে আমি খুবই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি এবং যথারীতি আগের মতোই এবারও আমি টিটোকে বললাম ঐ সাংগঠনিক দিকটা নিয়ে লেখাটা করতে। কিন্তু এই কথাগুলো একটা প্রবন্ধ আকারে হাজির করতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে বলে জানায় টিটো। তখন জিনিসটাকে এই আঙ্গিকে সাজানোর পরিকল্পনা করা হয়। টিটোর সাথে এই সওয়াল-জবাব বা প্রশ্নোত্তরগুলো অনেকটা পাতানো বলা যায়। আমরা দুজনেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগস্ট বিক্ষোভের সময় ও পরবর্তী আন্দোলনগুলোতে একসাথেই কাজ করেছি। ফলে অনেক কিছুই আমি পরিস্থিতি বোঝার জন্য তার কাছে প্রশ্ন করছি ব্যাপারটা এরকম না। পাঠকের সামনে তাড়াতাড়ি জিনিসগুলোকে হাজির করার উদ্দেশ্যেই মূলত সওয়াল-জবাব বা প্রশ্নোত্তর ধাঁচে এটাকে সাজানো হলো। কিছু জায়গায় টিটোও বলেছে যে, এইরকম একটা প্রশ্ন এখানে আসতে পারে বা প্রশ্নটাকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে। কিছু প্রশ্নের উত্তরে টিটোর পূর্ববর্তী লেখাগুলো থেকে হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে এখানে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে লেখাটা প্রশ্নোত্তর আকারে থাকলেও এটা কোনো আনুষ্ঠানিক আলাপচারিতা বা সাক্ষাৎকার না।— **পার্থ প্রতীম দাস**

প্রশ্ন: সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন সংঘটিত হলো, তাকে মুক্ত *বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন: জরুরী পর্ব* নামে আখ্যায়িত করার কারণ কী?

উত্তর: মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন বলতে আমি বুঝি, বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করার আন্দোলন— মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের আন্দোলন। আবার বিশ্ববিদ্যালয় ধারণা মাফিক বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বোঝায়, তা প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন। বিশ্ববিদ্যালয় ধারণায় বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, বিশ্বজনীন জ্ঞান সৃজন ও চর্চার ক্ষেত্র। মনুষ্যজীবনের উৎকর্ষ সাধন কিংবা মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ গড়ার জন্য জ্ঞান উৎপাদন ও তার চর্চা সমাজে প্রবাহমান রাখার উদ্দেশ্য, বিশ্ববিদ্যালয় ধারণার অংশ। কিন্তু সৃজনের পূর্বশর্ত হলো স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ছাড়া কোনো সৃজন হতে পারে না। স্বাধীনতাহীনতায় চর্চিত জ্ঞান বড়জোর 'দক্ষ' উৎপাদন করতে পারে, জ্ঞানী নয়। যে সমাজে সৃজন রুদ্ধ, সে সমাজে জ্ঞানও রুদ্ধ। ফলে স্বাধীনতাহীন বিশ্ববিদ্যালয় মূলত নিশ্চল বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ, বিশ্ববিদ্যালয় ধারণারই অংশ। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে একে রাষ্ট্র-কর্পোরেট-সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রভৃতি থেকে মুক্ত রাখা এবং সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার আন্দোলনই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন।

মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অবারিত। কোনো সীমারেখা দিয়ে একে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কাজেই মুক্তি মানেই তা অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তির ক্ষেত্রেও একে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব না। সুতরাং মুক্তির জন্য আন্দোলন একটি চলমান প্রক্রিয়া। কিন্তু সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি-কাল-পর্বকে চিহ্নিত করা সম্ভব। কখনো কখনো প্রয়োজনীয়ও হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে বর্তমানে একটি বিশেষ পরিস্থিতি জারি আছে। সরকারি ভাষায় একে 'জরুরী অবস্থা' নামে ডাকা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই 'জরুরী অবস্থা' হচ্ছে রাষ্ট্রীয় শাসন-যন্ত্রকে কর্পোরেট বিকাশের অনুকূল করে তোলার প্রচেষ্টা। কর্পোরেট বিকাশের জন্য, যে ধরনের রাজনৈতিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতির প্রয়োজন, তা নির্মাণ করা। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা একটা গণজনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলাম। এই গণজনতন্ত্রের মাধ্যমে আমরা একটা নতুন সামাজিক চুক্তির প্রতিফলন রাষ্ট্রের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রযন্ত্রটা ছিল উপনিবেশের গর্ভে জন্ম নেয়া রাষ্ট্রযন্ত্রেরই একটি তদ্ভব রূপ মাত্র। ফলে তার পক্ষে ঐ সামাজিক চুক্তিকে ধারণ করা সম্ভব ছিল না। আবার পরবর্তীতে পনের বছরের সামরিকায়নে রাষ্ট্রযন্ত্র আরো কর্তৃত্বশীল, আরো গণবিচ্ছিন্ন হয়েছে। ৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের পরেও এর কর্তৃত্বশীল চেহারা খুব একটা পাল্টায় নি। সংসদীয় স্বৈরতন্ত্র রূপে তা বহাল থেকেছে। প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশিক কায়দায় গড়ে ওঠা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কর্তৃত্ব পরম্পরার যে ছেদ সৃষ্টি হয় তা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে 'কর্তৃত্বের লড়াই' হিসেবে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই জরুরী অবস্থা মূলত উপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় খোলনলচেগুলোকে পাল্টে কর্পোরেট স্বার্থে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'ঢেলে সাজানো'র জন্যই হাজির হয়েছে। পূর্ববর্তী রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসে সুবিধাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দল-গোষ্ঠী-পক্ষগুলোকে সাইজ করতে এবং কর্পোরেট কর্তৃত্বতন্ত্র-বিরোধী গণমুখী আন্দোলনকে দমন করতে রাষ্ট্রের নিপীড়ণমূলক সংস্থাগুলো বিশেষভাবে তৎপর হয়ে পড়া এই 'জরুরী অবস্থা'র অবধারিত অনুসঙ্গ। আবার কর্পোরেট কর্তৃত্বতন্ত্রের মতাদর্শিক হাতল হিসেবে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো সামগ্রিক 'জরুরী অবস্থা'র পক্ষে প্রচার-প্রচারণা উৎপাদন জারি রেখেছে। ফলে সামগ্রিক সমাজটাই চিন্তাভাবনার দিক থেকে অনুর্বর ও কর্পোরেট কর্তৃত্ব-অনুগামী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আমাদের সামনে দৃশ্যমান।

এই পরিস্থিতিতে সমাজের অন্যান্য অংশের মতো বিশ্ববিদ্যালয়কেও নিপাট ভাষাহীন, প্রতিবাদরুদ্ধ করে ফেলার প্রয়োজন পড়েছে। রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়কে বাগে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাক্যাম্প পর্যন্ত স্থাপন করেছে, যা অতীতে কখনোই সংঘটিত হয় নি। ফলে 'জরুরী অবস্থা'য় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিস্থিতি কায়েম হয় তার মাত্রাগুলো স্পষ্টভাবে চেনা সম্ভব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে এই 'জরুরী অবস্থায়' অত্যন্ত জরুরীভাবে প্রতিবাদের-প্রতিরোধের কর্তব্য এসে হাজির হয়। এই কর্তব্যই আন্দোলনে রূপ নেয় এবং এই আন্দোলনই জরুরী প্রতিরোধ পর্বের আন্দোলন বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন: ৭৩'র অধ্যাদেশে তো বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে। তাহলে রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ করে কেমন করে?

উত্তর: আচ্ছা। ৭৩'এর অধ্যাদেশে স্বায়ত্তশাসন কথাটার উচ্চারণ এমনি এমনি হয় নি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সমাজে গণমুখী বিনির্মাণের যে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা এদেশের মানুষ লালন করেছিলো তারই জোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মনেও লেগেছিলো। আর এই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দৃঢ় জনমতের সামনে স্বায়ত্তশাসন কথাটা উচ্চারণ না করে ৭৩'এর অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা প্রায় অসম্ভব ছিলো। আর এই স্বায়ত্তশাসন কথাটার উচ্চারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কয়েকটা জায়গায় স্বাধীনতাও এনে দিয়েছিলো বটে। ৭৩'এর অধ্যাদেশের যে স্বায়ত্তশাসন, তা বিশ্ববিদ্যালয়কে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার জন্য অধস্তন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে। আবার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রশাসনিক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা কিংবা আলোচনা-সমালোচনারও সুযোগ দিয়েছে। এমনকী রাষ্ট্র সম্পর্কেও অনুরূপ একটা অবস্থান নেবার স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আছে। কিন্তু গত, চৌত্রিশ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র-স্বীকৃত এই স্বায়ত্তশাসনটুকুও রক্ষিত হয় নি। রাষ্ট্র-রাজনীতির কর্তৃত্বের শুঁড় ঢুকে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায়। স্বায়ত্তশাসন পরিণত হয়েছে আয়ত্তশাসনে। কিন্তু আপনার প্রশ্নের আগে, রাষ্ট্র-রাজনীতির কর্তৃত্বের শুঁড় কিংবা রাষ্ট্র-রাজনীতির আয়ত্তশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ে কায়েম হয় কেন— এই প্রশ্নের জবাব দেয়া জরুরী।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র হচ্ছে ক্ষমতা সংস্থাপনের একটা যন্ত্র। এই সংস্থাপিত ক্ষমতা কীভাবে এবং কতোটা প্রয়োগ করা যাবে— তা লেখা থাকে সংবিধানে। কিন্তু বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটির সংবিধান কোনো গ্রাম-সমবায় তথা পিপলস ফেডারেশনের সমন্বয়ের মাধ্যমে, তাদের জনমতের ভিত্তিতে রচিত হয় নি। এই সংবিধান প্রণীত হয়েছে উকিলদের দ্বারা। সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সংসদের হাতে। কিন্তু সংসদ মানেই তো সংবিধান মোতাবেক পার্টিজেন 'জনপ্রতিনিধি'। ফলে সামগ্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রটাই পার্টি-কর্তৃত্বের অধীন। রাষ্ট্রের চরিত্র পার্টিক্র্যাটিক। ফলে এটাকে পার্টিস্টেট বলাটা ভুল হবে না। পার্টিমাত্রই তার 'প্রতিপক্ষ' শ্রেণী-গোষ্ঠী-দল থাকে। ফলে তাকে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এই প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য— ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করবার জন্য দরকার হয় সমাজের অপরাপর প্রতিষ্ঠানগুলোকে পার্টি-কর্তৃত্বের আওতায় আনা। চলতি ভাষায় একেই বলে দলীয়করণ। বিশ্ববিদ্যালয়ও এ থেকে রেহায় পায় না। আবার ক্ষমতার মতাদর্শিক স্তম্ভ রচনার জন্যও প্রয়োজন হয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষমতার অঙ্গে পরিণত করা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ধারণায় যতোই স্বাধীনতা শব্দটা থাক না কেন, তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আর তাই ৭৩'এর অধ্যাদেশেও ফাঁকফোকর থাকে। আর তা দিয়ে ঢুকে পড়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের শুড়। ফলে স্বায়ত্তশাসন হয় আয়ত্তশাসন। এ থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, রাষ্ট্রের

কাঠামোতে পার্টি-কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য কোন অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতি নাই। আর এটাই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণের তথা ক্ষমতার অঙ্গে পরিণত হওয়ার বর্তমানের বাস্তবিক মূল কারণ।

এখন আপনার প্রশ্নে আসি। কীভাবে রাষ্ট্র-রাজনীতির আয়ত্তশাসন কায়েম হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের যেতে হবে ৭৩'এর অধ্যাদেশে। এই অধ্যাদেশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যমূলক দিক উল্লেখ করা যাক। এক. বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ হয় রাষ্ট্রপতি দ্বারা। দুই. বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে উপাচার্যের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক কাঠামোতে ক্রমকর্তৃত্বতন্ত্র। তিন. সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কাঠামোগতভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ না থাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জবাবদিহিতার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকা। এখন এই বিষয়গুলোকে সূত্রবদ্ধ করলেই উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন জনের প্যানেল থেকে একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। বলাই বাহুল্য, রাষ্ট্রপতির এই নিয়োগও হয় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মানেই তো একজন পার্টিজেন। আর তাই উপাচার্য হতে গেলে পার্টিজেন হতে হবে। এ কারণেই দেখা যায় যে, রাষ্ট্রক্ষমতায় পার্টি বদলালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য বদলে যায়। আবার উপাচার্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। 'বিশ্ববিদ্যালয়ে কী দৃশ্যমান, কী অদৃশ্যমান, কী চিন্তনীয়, কী অচিন্তনীয় তাবৎ কিছুর মালিক তিনি।' বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিন্ডিকেট-একাডেমিক কাউন্সিল সকল কিছুতেই তার আধিপত্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের তাবৎ নিয়োগ কমিটি, পদোন্নতি-কমিটির মালিক তিনি। এমনকী নিয়োগ কমিটির অন্যান্য সদস্যদেরও তিনিই নির্ধারণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কোষাধক্ষ্য-রেজিস্ট্রার-প্রক্টর-প্রভোস্ট-ছাত্র উপদেষ্টা ইত্যাদি প্রশাসনিক পদে তিনিই শিক্ষকদের নিয়োগ দেন। ফলে উপাচার্যের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনটি চরমভাবে সেন্ট্রালাইজড্ এবং ক্রমকর্তৃত্বতান্ত্রিক। সুতরাং উপাচার্য 'কট' হলেই পুরো বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় 'কট'। কিন্তু 'রাষ্ট্রের শুঁড় শুধু বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করে না, শুঁড়ের পাইপলাইনের মাধ্যমে ক্ষমতার হালুয়া-রুটিও পাস হয়' অর্থাৎ বরাদ্দ, ফান্ড, মালপানির মামলা আর কি। ফলে প্রশাসনের যে কোনো গদিতে বসতে পারলে ঐ মালপানির হিস্যা পাওয়া যায়। আর এ কারণেই গদিতে বসার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। উপাচার্যের নেক নজরে পড়লেই যেহেতু তা নিশ্চিত হবে সুতরাং উপাচার্যের মতোই অন্য শিক্ষকরাও শুরু করে দলবাজি। 'বেনীআসহকলা' নামের দলগুলি আসলে এক একটা পার্টির লেজমাত্র এবং এই দলগুলোর নামে চলতে থাকে শিক্ষক সমিতির ভোটাভোটি। কার কত শক্তি, কার কত ভোট, কে কত ইমপরটেন্ট ইত্যাদির হিসাব নিকাশ। উপাচার্য এখান থেকেই তার অনুগত ভৃত্যদের বাছাই করেন। নিয়োগ, পদোন্নতি প্রভৃতির জন্যও শিক্ষকরা তার মুখাপেক্ষী। শিক্ষক সমিতি মানে শিক্ষকদের অধিকার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক চিন্তার কোনো সংগঠন নয়। এটা পরিণত হয়েছে দলবাজির কারখানায়। এখানকার কর্মকর্তারা হচ্ছেন আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন পদের ক্যান্ডিডেট। শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তারা নিজেরাই এর মাধ্যমে নিজেদেরকে পদপার্থী তথা পদলেহী হিসেবে বিজ্ঞাপিত করেন।

এ তো গেলো শিক্ষক রাজনীতির কথা। কিন্তু ছাত্ররাজনীতি? ছাত্রদের রাজনৈতিক সংগঠনগুলো সবই কোনো না কোনো পার্টির লেজ। লেজুড়বৃত্তির সূত্রে তারা কোনো না কোনো পার্টির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা বড়জোর নিজ নিজ পার্টি এজেন্ডা বা মতাদর্শ বাস্তবায়ন করতে চায়তে পারে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতামত বা ইচ্ছার সাথে এগুলোর সম্পর্ক নাই। উপরন্তু দাপুটে ক্ষমতার মাৎসন্যায় নীতির ধারক-বাহক ছাত্র সংগঠনগুলো হল দখল, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, নিজেদের মধ্যে আধিপত্যের লড়াই ইত্যাদিতেই ব্যস্ত। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ত্তশাসন কায়েমের ক্ষেত্রে তারা হচ্ছে প্রধান ক্ষত্রশক্তি। উপাচার্য যে দলের, ক্যাম্পাসে সেই দলের ছাত্র সংগঠনেরই কর্তৃত্ব। কেননা প্রশাসন হচ্ছে সেই ছাত্র সংগঠনের পাহারাদার। আর এই ছাত্র সংগঠনগুলো হচ্ছে প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্রের লাঠি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র-রাজনীতির কর্তৃত্ব বলবৎ হয় মূলত উপাচার্যের চরম ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতার অনুসঙ্গ শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি দ্বারা।

প্রশ্ন: রাষ্ট্রের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্পোরেট ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের কথাও বলেছেন আপনি। এটা কিভাবে কায়েম হয়?

উত্তর: মুক্তবাজার অর্থনীতি বলে যে প্রত্যয়টি চালু আছে তার প্রকৃত মানে হচ্ছে বাজারের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব। জগতের সবকিছুকেই বাজারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। বাজার কর্তৃত্বের বর্তমান রূপটি হচ্ছে কর্পোরেট একচেটিয়া। কর্পোরেটের স্বার্থে সমাজকে একটি উন্নতমানের ভোক্তা শ্রেণীতে রূপান্তর করা এই বাজার যুগের প্রধান সাংস্কৃতিক প্রবণতা। ফলে বাজারের চিন্তা-বাজারের মতাদর্শ-বাজারের সংস্কৃতি উৎপাদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে হাতল হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সিলেবাসের মধ্যে ক্লাসিক্যাল যুগের জ্ঞানকাণ্ড চর্চার যে আবহ তৈরি হয়ে আছে তা প্রতিস্থাপন করে একেবারে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে উন্নতমানের এক্সিকিউটিভ উৎপাদনের জন্য যে ধরণের জ্ঞানকাণ্ডের প্রয়োজন সেই ধরণের জ্ঞান চর্চার প্রবাহ তৈরির তৎপরতা চলছে। আবার মুনাফামুখীন কর্পোরেট মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির ছাঁচে গড়া সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রচার-প্রচারণা নেহাত কম নয়। ফলে পুঁজিবাদ যা শিল্পমূল্যকে বাজারমূল্যে রূপান্তর করতে চায়— মানবিক রুচিশীলতাকে বাজার রুচিশীলতায় রূপান্তর করতে চায়, তার বিশেষ তৎপরতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যাচ্ছে। ক্রমাগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সমাজ 'খাদক সমাজে' রূপান্তরিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিন ধরে চর্চিত মুক্তিমুখীন সংস্কৃতি ও আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক একুশ-পহেলা বৈশাখ-স্বাধীনতা দিবস কিংবা বিজয়ের চেতনা— এ সবকিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে কর্পোরেট বিজ্ঞাপন-স্পন্সরশীপ আর তার লোভ দেখানো সুযোগ-সুবিধার তোড়ে এসব সংস্কৃতি ও আকাঙ্ক্ষার খুবই ভিন্ন মানে উৎপাদন করা হচ্ছে। যেমন স্বাধীনতা বলতে আপনি কত কম খরচে এবং কত বেশি দিনের ব্যবধানে বাংলালিংক কর্পোরেট মোবাইল কোম্পানির সীমটি রিচার্জ করতে পারবেন, তা বোঝানো হচ্ছে। ভাষার স্বাধীনতা বলতে সিটিসেল ফোনে পারস্পরিক, আগের থেকে বেশি এসএমএস পাঠানোর সুবিধাকে বোঝানো হচ্ছে। ফলে স্বাধীনতা সংজ্ঞায়িত হচ্ছে কর্পোরেটের দ্বারা, কপোরেটের স্বার্থানুসারে। কর্পোরেট কর্তৃত্বতন্ত্র তার একচেটিয়া অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং মিডিয়া প্রতিষ্ঠান-জনসংযোগ ইন্ডাস্ট্রি ও বাজার সম্পর্ক কায়েম ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য-আগ্রাসন চালাচ্ছে।

প্রশ্ন: রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের জায়গা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কাঠামো দাঁড়িয়েছে তার সাথে আগস্ট বিক্ষোভের কোনো সম্পর্ক আছে কী?

উত্তর: হ্যাঁ, তা তো আছেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোটি চরমভাবে সেন্ট্রালাইজড এবং ক্রমকর্তৃত্বতান্ত্রিক। এটা আমি আগেই বলেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটাও সেই আদলেই তৈরি হয়েছে। গুটিকয়েক আমলাশিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে কাঠামোগতভাবে যুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু তারাও রাষ্ট্র-রাজনীতি কর্তৃক নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত উপাচার্যের তল্পিবাহক। আবার সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান যেমন সিনেট, সিন্ডিকেট, কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন (ছাত্র সংসদ), বিভাগীয় সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে কিছু কিছু পরিমাণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলেও বর্তমানে এর একটিতেও শিক্ষার্থীদের কোনো প্রতিনিধিত্ব বা অংশগ্রহণ নেই, এগুলো নিষ্ক্রিয় আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো একেবারেই স্থগিত। ফলে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের কোনো প্রকার সুযোগ অনুপস্থিত, প্রশাসনের গুটিকয়েক আমলাশিক্ষক তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, যে সিদ্ধান্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে তৈরি করেন সেটাই যেন সকলের ভাগ্য। আরো লক্ষ্যণীয় ঘটনা হলো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এতো কেন্দ্রীভূত হওয়া সত্ত্বেও এর জবাবদিহিতার জন্য কোনো কাঠামো নেই। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের স্বৈরতন্ত্র নিরঙ্কুশভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়াশীল। এই পরিস্থিতিতে যদি রাষ্ট্রীয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোনো সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় তাহলে তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। আর আন্দোলন মানেই সংগঠিত হওয়া। কিন্তু 'জরুরী অবস্থা'য় অধ্যাদেশ জারি করে এই সংগঠিত হওয়া, সংগঠন করা তথা মিছিল-সমাবেশ-প্রতিবাদ ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সরকারি এই সিদ্ধান্ত একদিকে রাষ্ট্রের অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের স্বৈরতন্ত্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় আরো তীব্র মাত্রা যোগ করে। সামগ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় যেন নিপাট ভাষাহীন-প্রতিবাদহীন, রাষ্ট্রের অনুগত-গৃহপালিত একটা জিনিস হিসেবে হাজির থাকে তার আয়োজন সম্পন্ন করা হয়। দু-একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন সেশন চার্জ ৫৬১ থেকে বাড়িয়ে একলাফে ৩৪০০ টাকা নির্ধারণ করেছে। জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যসভা, সংস্কৃতিসভা, গান-নাটক, এমনকী দর্শন, সমাজবিজ্ঞান,

ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাসভা, সেমিনার বন্ধ করে দিয়েছে। ২০০৭-এর ভয়াবহ বন্যার সময় প্রক্টর বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাণ সংগ্রহ তৎপরতা বন্ধ করে দেয়। এসব নিয়ে শিক্ষার্থীরা পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করে উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের অবহিত করেও কোনো প্রতিকার পায় নি। অথচ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রশাসনের পাহারায় হলে হলে 'শিবিরের আইন' মানতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বাধ্য করেছে। এই চিত্র কমবেশি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের। আবার অতিরিক্ত পুলিশি নজরদারি ও তৎপরতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পদে পদে হয়রানির শিকার হচ্ছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলামেশা, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিষয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপ, কটূক্তি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন দাপুটে ক্ষমতার নগ্ন রূপকেই প্রতিপন্ন করে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গুমোটের মধ্যে গুমরে মরছিল। ফলে তাদের মনে ক্রমাগত ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। এই ক্ষোভ ও অসন্তোষ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, সমাজের অনান্য অংশ, যারা আধিপত্যশীল দাপুটে ক্ষমতার চরম নির্যাতন-নিপীড়ণের শিকার, তাদের মনেও দানা বেঁধে ছিল। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি, বস্তি উচ্ছেদ, হকার উচ্ছেদ এগুলো হচ্ছে এই নির্যাতন-নিপীড়ণের নমুনা। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামে যখন সেনাক্যাম্প স্থাপন করা হয় এবং সেনাসদস্য কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীকে নির্যাতন-নিপীড়ণের ঘটনা ঘটে, তখন শিক্ষার্থীদের বিক্ষুব্ধ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা থাকে না। স্ফূলিঙ্গ থেকে নিমিশেই তখন দাবানল তৈরি হয়। এই বিক্ষোভ যেহেতু আধিপত্যশীল দাপুটে ক্ষমতার বিরুদ্ধে, কাজেই সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত অংশও এতে যোগ দেয়। ফলে মোট কথা হচ্ছে যে: ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হয়ে উঠলে, সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী হয়ে উঠলে মানুষ তার অস্তিত্ব তথা স্বাধীনতা রক্ষার্থেই প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে প্রতিরোধের আকর হিসেবে প্রথমত কাজ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

প্রশ্ন: আগস্টের ছাত্র বিক্ষোভের পরে প্রতিবাদ কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু তারপরে আবার এতোবড় একটি ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়ে গেল। এর শুরুটা কেমন ছিল?

উত্তর: আগস্টের ছাত্র বিক্ষোভ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং এর কোনো সাংগঠনিক কাঠামো ছিল না। ফলে ২২শে আগস্ট বিক্ষোভ যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন রাষ্ট্রের ক্ষমতার ভিত কেঁপে যায়। ফলে রাষ্ট্র আরো সহিংস ও নিপীড়ণমূলক হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ মেট্রোপলিটন শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। কারফিউ জারি করে দেশটাকে একটা জেলখানা বানিয়ে ফেলা হয়। সেই সময় বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে পেলে তাদের উপর নির্বিচারে সেনাবাহিনী-পুলিশ-বিডিআর-র‍্যাব প্রভৃতি 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী'র অমানুষিক-বিভৎস নিপীড়ণ-নির্যাতন নেমে আসে। এমনকি রাষ্ট্র তার অনুগামী বন্ধুত্বপরায়ণ মিডিয়াকেও চরম কর্তৃত্বশীলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে। টিভি চ্যানেলগুলোর সকল প্রকার টক্-শো বন্ধ করে দেয়া হয়। সেল ফোনের নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিয়ে সামগ্রিক নাগরিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিচ্ছিন্ন করা হয়। রাস্তায় সেনাবাহিনীর যুদ্ধংদেহী তৎপরতা দেখা যায়। পরিস্থিতিটা একবারেই রুদ্ধশ্বাসের। আর এরকম একটি পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক কাঠামোহীন স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ চলতে পারা প্রায় অসম্ভব। আবার দু-তিন দিন পর এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি অল্পবিস্তর শিথিল হলেও শুধুমাত্র সাংগঠনিক কাঠামোর অভাবে শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরাও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই তীব্রমাত্রার প্রতিরোধ দেখা যায় নি— আপনার বক্তব্য সঠিক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়সহ অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা শুরু হলে পরিস্থিতি বদলাতে থাকে।

পরিস্থিতি বদলে কেমন করে পরবর্তী সময়ে এতোবড় একটা ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হলো তা আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা বলতে পারব। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর পর শিক্ষার্থীদের মনে এক ধরণের ভয়, আশঙ্কা এবং ক্ষোভ মিশ্রিত একটা অবস্থা দেখা যাচ্ছিল। শিক্ষার্থীরা এরই মধ্যে অন্যায়ভাবে আটককৃত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মুক্তির বিষয়টি নিয়ে ক্রমাগত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু ক্ষমতাতাড়িত মিডিয়ার নিরন্তর প্রচারণা— বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এ...ই মুক্তি পাচ্ছেন— শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধের জন্য সংগঠিত হওয়াকে অনেকটাই বিলম্বিত করে ফেলে। কিন্তু এরই মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিম্ন আদালতের রায়ে দণ্ড দেয়া হয়। রায়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ভাঙচুর কিংবা সহিংসতায় মদদ প্রদানের অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করা হয়। শুধুমাত্র মৌন মিছিল করে জরুরী বিধিমালা ভঙ্গ করার 'অপরাধে' তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের এমন অবস্থায় দেখে আবেগী হয়ে ওঠে। তাদের মূল্যবোধ, বিবেক তাদেরকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। যে শিক্ষকদের শাস্তি দেয়া হয় তারা শিক্ষার্থীদের কাছে পূর্ব থেকেই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ফলে ঐ শিক্ষকদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের মুক্তির জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। বিপুল পরিমানে গোয়েন্দা নজরদারি ও পুলিশি চাপের মধ্যেও তারা স্বাক্ষর সংগ্রহ, স্মারকলিপি প্রদান, সংবাদ সম্মেলন প্রভৃতি তৎপরতা চালাতে থাকে। এসব তৎপরতার সময় তারা কৌশলগত কারণে এমন ধরণের কর্মসূচিগুলোই হাতে নেয় যা জরুরী আইন ভঙ্গ করে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীদের তৎপরতার মাত্রাটাও বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মুক্ত চিন্তা ও চর্চার একটা প্রবাহের সাথে আগে থেকেই যুক্ত। ক্ষমতা-রাষ্ট্র-রাজনীতি-মতাদর্শ-কর্পোরেট মিডিয়া প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা ও প্রশ্ন করার সংস্কৃতি এই বিভাগে গড়ে উঠেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের তৎপরতার মাত্রাটা ছিল বেশি। শিক্ষকদের মুক্তি দাবি করে একসাথে ৮০/৯০ জন শিক্ষার্থী উপাচার্যের কাছে বিভাগের প্রায় সকল শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করে। বিভাগের শিক্ষার্থীদের এই একসাথে হেঁটে উপাচার্যের কাছে যাওয়া প্রকৃতপক্ষে একটি প্রতিকী মৌন মিছিল রচনা করে। যা ঐ সময়ে ছিল খুবই সাহসী পদক্ষেপ। আবার এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা অঘোষিতভাবে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে ক্লাস বর্জন করে। এভাবে ক্লাস বর্জন সামগ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে— এই আশঙ্কায় রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উদ্বিগ্ন হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ক্লাস বর্জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগেও ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তারা আল্টিমেটাম দিয়ে ক্লাস বর্জনের ঘোষণা দেয়। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থীরা ও কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোট শিক্ষার্থীদের মাঝে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবেগ অনুভূতি ও তৎপরতা এবং শিক্ষকদের উচ্চ নৈতিকতার প্রতি সারাদেশের মানুষের সমর্থন ও মানসিক লিপ্ততা তীব্রভাবে যুক্ত ছিল। ফলে এই পরিস্থিতিতে সরকার বেশ চাপের মুখে পড়ে এবং গণদাবির মুখে ২০০৭ এর ১০ ডিসেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মুক্তি দেয়। গণদাবির সামনে নতজানু হয়ে রাষ্ট্র শিক্ষকদের মুক্তি দিলেও তাদের মুক্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র 'সাধারণ ক্ষমা'র আশ্রয় নেয়। রাষ্ট্রের এই 'সাধারণ ক্ষমা' অনেকটা 'রেললাইনে বডি দেব, মাথা দেব না' নীতির পরিচায়ক। রাষ্ট্রের এই নীতি স্পষ্টভাবে তাকে উলঙ্গ করেছে— রাষ্ট্র যে ঘায়েল হয়েছে, তার শরীরেই ঘা খেয়েছে— তা প্রমাণিত। শিক্ষকদের মুক্তি পর্যন্ত এই আন্দোলনই পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট বৃহৎ আন্দোলনের পাটাতন হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন: আপনি আন্দোলনের এই পর্যায়ে শুধু বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের কথাই বললেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্র সংগঠনগুলো আছে তাদের কী কোনো তৎপরতা ছিল না?

উত্তর: না, তাদের কোনো তৎপরতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সামনে দৃশ্যমান হয় নি। আর আমার মনে হয় জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার পর মাৎস্যন্যায় নীতিতে বিশ্বাসী ছাত্র সংগঠনগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সাংগঠনিক তৎপরতা চালানোর মতো নৈতিক শক্তি ছিল না। অপরদিকে এই জরুরী অবস্থাতেই বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো সাংগঠনিক দিক থেকে মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। এছাড়া চিন্তা ও চর্চার অর্থাৎ পরিস্থিতি বোঝার স্বকীয় কোনো দৃষ্টিভঙ্গি এখানকার বর্তমান বাম নেতৃত্বের নেই বললেই চলে। কিন্তু একেবারে ভেতরে ভেতরে কিংবা খুবই ঘরোয়াভাবে কোনো তৎপরতা ছিল কিনা তা ঐ ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেরাই ভালো বলতে পারবেন। আমার জানা নেই।

প্রশ্ন: শিক্ষকদের মুক্তির এই আন্দোলনের পরে ঈদের ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবিতে *কর্তৃত্ব-বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ* মঞ্চের আহ্বানে অনেক বেশি সংগঠিত ও তীব্র একটা আন্দোলন গড়ে উঠতে দেখলাম আমরা। এই মঞ্চটা গড়ে উঠল কেমন করে?

উত্তর: আচ্ছা। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর কিছুদিনের মধ্যেই মামলার শিকার শিক্ষার্থীরা আদালতে 'আত্মসমর্পন' করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মুক্তির পর শিক্ষার্থীদের মুক্তির প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে ওঠে। এই সময়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট, একাউন্টিং ইত্যাদি বিভাগের শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের একটি প্লাটফর্মের বিষয়ে একমত হয়। এইসব বিভাগের সচেতন শিক্ষার্থীরা এক বৈঠকে এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে। বৈঠকে প্ল্যাটফর্মের নামের বিষয়ে কথা উঠলে বিভিন্ন নাম প্রস্তাবিত হয়। নামগুলো কোনোটি বিমূর্ত, কোনোটি রাজনৈতিক দলীয় লেজুরবৃত্তির অসচেতন চিন্তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে বাতিল হয়ে যায়। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী ও ছোট কাগজ কর্মী বাধন অধিকারীর প্রস্তাবনা ঈষৎ সংশোধন করে *কর্তৃত্ব-বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ* নামটি গৃহীত হয়। অতঃপর সামান্য কিছু ঝক্কি-ঝামেলা পার করে এর একটি সমন্বয় পরিষদ গঠন করা হয়। সমন্বয় পরিষদ ছিল প্রাথমিক অবস্থায় ১৯ সদস্য বিশিষ্ট। পরে তা বর্ধিত হয়ে ২৬ সদস্য বিশিষ্ট হয়। এই সমন্বয় পরিষদ গঠনের পরে সংবাদ সম্মেলন করে ১০ই জানুয়ারী সংগঠনের আত্মপ্রকাশের কথা ঘোষণা করা হয়। বলে রাখা ভালো, সমন্বয় পরিষদ গঠনের একটা অন্যতম কারণ ছিল নিজেদের দ্বারা সংগঠিত কর্মকাণ্ডের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করা। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। ২০০৭ এর ২১শে আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের কিছু মুক্তিমুখীন সক্রিয়ক-মত সংগঠক-বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষার্থী-সাংস্কৃতিক কর্মী স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রতিবাদে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-

শিক্ষকদের উপর হামলা রুখে দাঁড়াও/ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ চলবে না" উচ্চারণকে ব্যানারে লিখে মৌন মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত করে। এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চিন্তাসমৃদ্ধ এবং লক্ষ্য অভিমুখী। কিন্তু ২২শে আগস্টে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণরোষের কারণে বিপুল পরিমাণ সহিংসতা ঘটে। এটা চিন্তা সমৃদ্ধ ও লক্ষ্য অভিমুখী সংগঠিত প্রতিবাদ ছিল না। কিন্তু ২২ তারিখে সহিংসতায় অংশ না নিলেও ২১ তারিখের প্রতিবাদে অংশ নেয়া ৪ শিক্ষক ও বেশ কিছু শিক্ষার্থীর ঘাড়ে এই সহিংসতার দায়ভার চাপানো হয়। তাই এখান থেকে আমাদের এটাই শিক্ষা হয় যে, আমরা যা করব তা আগে থেকে ঘোষণা দিয়ে তার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব নিয়েই করব। অন্যদের কার্যক্রমের দায়দায়িত্ব আমরা নেব না। ফলে এরকম পরিস্থিতিতে সেই দায়দায়িত্ব গ্রহণের অবস্থান থেকেই সমন্বয় পরিষদ তৈরি হয়।

প্রশ্ন: সমন্বয় পরিষদ গঠনে সামান্য কিছু ঝক্কি-ঝামেলার কথা বললেন। সেটা কী?

উত্তর: প্রশ্নটি খুব স্পর্শকাতর। কেননা এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বলব তা সংকীর্ণ মনোভাবাপন্নদের খোঁচা মারামারির মতো কোনো ঘটনা হয়ে যাবে কিনা তা নিয়ে আমি শঙ্কিত। উত্তরটিকে আমি যথা সম্ভব এ থেকে দূরবর্তী কোনো অবস্থানে নিয়ে দিতে চাই। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোট এবং প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো কিছু একটা করতে চায়— আমাদের এমনটা মনে হয়েছিল। আবার সাংস্কৃতিক জোটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা বর্তমানের জোট-সভাপতি নোবেল ভাই এ বিষয়ে বেশ আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন। ফলে আমাদের মঞ্চ গঠনের সভায় আমরা তাকে আমন্ত্রণ জানাই। সভায় তিনি এবং উদিচীর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্র ইউনিয়ন রাবি শাখার সদ্য বিদায়ী কার্যকরী সভাপতি প্রশান্ত কুমার মণ্ডল আসছেন বলে আমরা জানতে পারি। সভা শুরুর অল্পক্ষণের মধ্যে তারা সভায় যোগ দেন। ছাত্র ইউনিয়নের সদ্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক প্রমথেশ শীল সভাস্থলের পাশে থাকায় তাকেও আমরা সভায় যোগ দেবার কথা বলি। তার কাজ আছে বলে তিনি সভায় বসেন নি। এরপরে সভায় মঞ্চের নাম ঠিক করা হয় এবং বন্দী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা, যে সংবাদ সম্মেলন করবেন তা তদারকির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য লেখার দায়িত্ব প্রশান্ত গ্রহণ করেন। আর অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ ও তাদের দেখভালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র অসীম। সংবাদ সম্মেলনের জন্য মনোনীত স্থান হিসেবে রাজশাহী প্রেস ক্লাবকে নির্ধারণ করার কারণে আমি প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব গ্রহণ করি। সভায় সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য লেখার সময় শিক্ষার্থীদের সাধারণ ক্ষমা বা দণ্ড মওকুফ কথাগুলো উচ্চারণ যেন কোনোমতেই না করা হয় সে বিষয়ে প্রশান্তকে সভা থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়। কেননা সাধারণ ক্ষমা বা দণ্ড মওকুফ কথাটার স্বেচ্ছা উচ্চারণ সামগ্রিক ছাত্র আন্দোলনের বুকে ছুরি মারার সামিল। কিন্তু প্রশান্ত এ ক্ষেত্রে সতর্ক থাকেন নি। সংবাদ সম্মেলনে কারাবন্দী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দণ্ড মওকুফ তথা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করা হয়। অভিভাবকরা সন্তানের মুক্তির জন্য খুবই আবেগী ছিলেন। এই আবেগঘন অবস্থায় তাদের সামনে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে তা তারা ঐ সময়ে নিঃশঙ্কোচে পাঠ করে ফেলেন। দণ্ড মওকুফ তথা সাধারণ ক্ষমার জন্য আবেদন ছাত্র আন্দোলনের ন্যায্যতার পরিপন্থী। আবার মঞ্চের সিদ্ধান্তকে সবগুলো পক্ষের সাথে আলোচনা না করে 'এডভোকেট বলেছেন'— উছিলায় পাল্টে ফেলা স্বেচ্ছাচারের সামিল এবং তা মঞ্চের কার্যকারিতার বিরুদ্ধে যায়। অঙ্কুরেই যে মঞ্চের কার্যকারিতা হুমকির মুখে পড়েছে তা কি আদৌ কোনোভাবে আগামীতে কার্যকর হতে পারবে?— এমন একটা শঙ্কা আমাদের অনেকের মনেই জেগেছিল। এমন সময় প্রমথেশ শীল আমাদের মঞ্চের দু-এক জন কর্মীর সামনেই বেশ দাম্ভিকভাবেই ঘোষণা করেন "আমি ঢাকা থেকে যে মিশন নিয়ে এসেছি, তাতে সফল হয়েছি।" মিশনের অর্থ বুঝতে আমাদেরও বাকি থাকে না। ফলে আমরা আরো দৃঢ় ও সতর্ক হয়ে উঠি এবং একেবারেই কাছাকাছি থাকা আন্তরিক কর্মীদের সমন্বয়ে একটি সমন্বয় পরিষদ গঠন করে *কর্তৃত্ব-বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ* মঞ্চের আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দেই। ঘোষণায় মঞ্চের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অবস্থান খুবই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়।

প্রশ্ন: তাহলে এটা কী একটা ষড়যন্ত্র?

উত্তর: না, বিষয়টিকে আমি একজন ব্যক্তির কিংবা ব্যক্তি যে সংগঠনের সাথে যুক্ত তাদের সংগঠিত একটা ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখতে পছন্দ করব না। বরং এটা হচ্ছে পার্টি ঘরানায় চর্চিত সংস্কৃতিরই বহিঃপ্রকাশ। সেখানে যে ধরণের চিন্তা ও যুক্তি চর্চার ধারা গড়ে উঠেছে এটা মূলত তারই সংকট। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দোষ না। এ ধরণের চিন্তা ও যুক্তি চর্চায় আন্দোলনকে 'নিয়ন্ত্রণের' একটা ইচ্ছা ও আচরণ গড়ে ওঠে। এই 'নিয়ন্ত্রণ' নিজ হাতে রাখার জন্য অন্যান্য পক্ষগুলোর সাথে কখনো কখনো বিবাদে জড়িয়ে পড়া, নির্বিচার প্রচারণা চালানো পার্টি ঘরানায় সাধারণ একটা ব্যাপার। ফলে এটাকে ষড়যন্ত্র নয় বরং পার্টি সংস্কৃতি বলেই চিহ্নিত করা যায়।

প্রশ্ন: আপনাদের এই মঞ্চটার নাম *কর্তৃত্ব-বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ* দিলেন কেন? কর্তৃত্ব বিরোধিতা বলতে আপনারা কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর: সমাজ একটা শব্দের বিভিন্ন অর্থ চর্চা করে থাকে। ফলে কখনো কখনো শুধুমাত্র অর্থ চর্চার ভিন্নতার কারণেই শব্দ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। আবার একই ধারণা বা অর্থকে ভিন্ন নামে বা প্রতীকে চিহ্নিত করার কারণে বিতর্ক থাকে। কর্তৃত্ব শব্দটিকে নিয়ে এমন ধরণের বিতর্ক অনেকের মধ্যেই আছে। তাই যে ধারণাটিকে আমরা কর্তৃত্ব শব্দ দ্বারা মূর্ত করতে চেয়েছি সেই ধারণাটিকে প্রকাশ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। কর্তৃত্ব মানে কর্তাগিরি। কর্তৃত্ব হচ্ছে সহজ কথায় শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র কর্তার ইচ্ছায় কর্ম সাধিত হওয়া। অর্থাৎ যখন কর্তার খেয়াল খুশি মোতাবেক কাজ করা হয়— যাতে অন্য কারো কিছু বলার বা করার থাকে না তখন তাকে কর্তৃত্ব বলা হয়। সুতরাং কর্তা হওয়া এবং অন্যের বিষয়ে নাক গলানোর বা সিদ্ধান্ত নেওয়া কিংবা দেয়াই হচ্ছে কর্তৃত্ব। কিন্তু এই মাফিক কর্তা কে? কোনো ব্যক্তির বাইরের শক্তি যা ঐ ব্যক্তির ইচ্ছার তোয়াক্কা না করেই ব্যক্তির উপর বল বা শক্তি প্রয়োগ করে। সুতরাং কর্তৃত্ব হচ্ছে একটা সম্পর্ক যেখানে কর্তা ও উদ্দিষ্ট থাকে এবং কর্তা উদ্দিষ্টের উপর বল বা শক্তি প্রয়োগ করে। কর্তৃত্ব বলতে আমি শক্তিমানের বলপ্রয়োগকেই বুঝি। আবার কর্তৃত্বের সাথে ক্ষমতার একটা সম্পর্ক আছে। কর্তৃত্ব যদি 'শর্ত' বা 'সূত্র' সাপেক্ষ হয় অর্থাৎ চুক্তির বাঁধনে বাঁধা পড়ে এবং চুক্তির উপর ছদ্ম-সম্মতি প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই আমরা তাকে ক্ষমতা বলতে পারি। সুতরাং ক্ষমতা নিজেও হচ্ছে এক ধরণের সম্পর্ক। ক্ষমতা সম্পর্ক হচ্ছে 'বল প্রয়োগের স্বীকৃত' 'শর্ত' বা 'সূত্র' যা ছদ্ম-সম্মতির দ্বারা বৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং সামাজিক সম্পর্কের যুথবদ্ধতার সূত্রকে ভেঙ্গে কর্তৃত্ব কায়েম করে। এই কর্তৃত্ব আরোপণ যখন একমুখী হয়ে পড়ে তখন তাকে বলা হয় অসম ক্ষমতা সম্পর্ক। এই অসম ক্ষমতা সম্পর্ক মূর্ত হয়ে ওঠে প্রধানত চারটি বিষয়ের মাধ্যমে। এই চারটি বিষয় হচ্ছে ১. ভূমির অসম মালিকানা, ২. শ্রমের উদ্বৃত্ত শোষণ, ৩. দেহগত বা লৈঙ্গিক আধিপত্য, ৪. ভাষা-সংস্কৃতি-জ্ঞানগত আধিপত্য। কর্তৃত্বের এই প্রধান চতুর্মূর্তিই সকল প্রকার শোষণশাসন ও আধিপত্যের জড়। ফলে কর্তৃত্ব-বিরোধিতা বলতে আমি এই শোষণশাসন ও আধিপত্যের বিরোধিতা এবং এগুলোকে সমাজ থেকে চিরতরে উচ্ছেদের জন্য তৎপরতা চালানোকেই বুঝি। ফলে কর্তৃত্ব-বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকারও ব্যক্ত করা হয়। এই চিন্তা ও ধারণাকে সামনে রেখে আমরা আমাদের মঞ্চের নাম দিই *কর্তৃত্ব-বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ*।

প্রশ্ন: আপনি অসম ক্ষমতা সম্পর্কের যে চারটি দিকের কথা বললেন, তা টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্র তো একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। তাহলে আপনি কি রাষ্ট্রেরও বিরোধী?

উত্তর: এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ভুল বোঝার অবকাশ থাকবে। তাই এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমাকে আগে দেশ ও রাষ্ট্র এদুটো ধারণাকে আলাদা করে নিতে হবে। কেননা আমাদের এখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরাও দেশ ও রাষ্ট্র বলতে একই জিনিস বোঝেন। প্রকৃতপক্ষে দেশ ও রাষ্ট্র এক জিনিস নয়। দেশ বলতে আমি চিরচেনা প্রতিবেশের মধ্যে স্বাধীনতা ও সংহতি চর্চার যে বৃহত্তর ক্ষেত্র গড়ে ওঠে, তাকে বুঝি। লোপামুদ্রার গানে "আমার কাছে দেশ মানে এক লোকের পাশে অন্য লোক" কিংবা "মন যতদূর চাইছে যেতে ঠিক ততদূর আমার দেশ"— এই উচ্চারণ আমার বক্তব্যের পক্ষে সমর্থন যোগায়। অপরদিকে রাষ্ট্র হচ্ছে শাসনের তথা ক্ষমতা-কর্তৃত্ব-আধিপত্যের একটা সংস্থা— কেন্দ্রীয় সংস্থা। সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া, সিদ্ধান্ত দেয়া অর্থাৎ সকল বিষয়ে নাক গলানোর এবং মাতবরির ক্ষমতাধারী একটি প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের সামাজিক চুক্তির ধারণায় রাষ্ট্রকে একটা ক্ষমতা কাঠামো হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। তবে এই ক্ষমতার অস্তিত্বের শর্ত হচ্ছে জনগণের অধিকার সংরক্ষণ। ফলে অধিকার সংরক্ষণ করতে গিয়ে রাষ্ট্র কী পরিমান ক্ষমতা, কখন, কেন এবং কীভাবে প্রয়োগ করতে পারবে তা চুক্তি তথা সংবিধানে লিখিত থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোটি চরমভাবে ক্রমকর্তৃত্বতান্ত্রিক এবং এটি বিশাল আমলাতান্ত্রিক বপুসমৃদ্ধ জিনিস। ফলে এটি খুবই নিষ্প্রাণ, যান্ত্রিক সুরতালছন্দে নড়াচড়া করে। এ কারণে সংবিধান বা চুক্তিপত্রের সৃজনশীল প্রয়োগ তার পক্ষে সম্ভব হয় না। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। কোনো এক আইনে লেখা ছিল: ঘোড়া চুরি করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু কোনো চোর ঘোড়া নয়, ঘোড়ার বাচ্চা চুরি করলে তাকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। কেননা আইন ও তার ভাষার পাঠ উদ্ধার এবং সেই মাফিক তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হর্তাকর্তারা সৃজনশীল থাকতে পারেন না।

আবার রাষ্ট্র যখন নিজকে পিপলস রিপাবলিক বলে পরিচয় দেয় তখন রাষ্ট্রক্ষমতা চালনার জন্য জনগণের প্রতিনিধি দরকার হয়ে পড়ে। এই প্রতিনিধিদের ঐক্যের জন্য মতাদর্শও দরকারী হয়ে পড়ে। আর মতাদর্শের চর্চার জন্য প্রয়োজন হয় পার্টির। এই পার্টি হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতা ও জনগণের মধ্যে হাইফেন। কিন্তু রাষ্ট্রের কেন্দ্র-কর্তৃত্ব এবং তার কাঠামোগত সেটিং-এর কারণেই জনপ্রতিনিধিরা হয়ে পড়েন 'ব্ল্যাংক চেক প্রাপ্ত'। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্মতি বলতে স্রেফ ঐ মতাদর্শ। ফলে প্রকৃত অর্থে তার কাজ হলো সিদ্ধান্তকে ইয়েস অথবা নো বলা। কখনো কখনো সেটার সুযোগও থাকে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রকে আমি কোনোভাবেই জনগণের প্রতিষ্ঠান বলতে পারি না। তার ক্ষমতাকেও আমার জন্য বৈধতা দেয়ার কোনো কারণ নাই।

আমার কোনো একটা লেখায় আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সেলিম রেজা নিউটনকে আমি উদ্ধৃত করেছিলাম। রাষ্ট্র সম্পর্কে আমার বিচার ঐ উদ্ধৃতিরই অনুগামী। সেই মাফিক রাষ্ট্রের যে ধারণা আমার কাছে দাঁড়িয়েছে: আধুনিক কালে রাষ্ট্র হচ্ছে এলিটদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ম্যানেজারিয়াল সিস্টেম। এলিটদের স্বার্থরক্ষাকারী সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার কমিটি হচ্ছে এই রাষ্ট্র। রাষ্ট্র নামক এই কমিটির কাজ এলিটদের নিজেদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করা, ছোটলোকদের শোষণ করে বড়লোকদের ধনসম্পদ পাহারা দেয়া, মৌলিক অর্থে 'প্রতিপক্ষ' শ্রেণী-গোষ্ঠী-দল-শক্তিকে ধ্বংস করা ইত্যাদি। এলিটদের— শাসকশোষকদের তৈরি করা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে 'সমন্বয়' সাধন করা এই কমিটির আরেকটা কাজ। এই সব ফরজ কর্ম সম্পাদনের জন্য এই কমিটির হাতে থাকে আমলাতন্ত্র বা প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিচার বিভাগ বা আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহ, উর্দি বিভাগ বা পুলিশ-সেনা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ মিডিয়া বা মতাদর্শিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।

সুতরাং সমাজ পরিচালনার জন্য এইরকম গণবিরোধী একটা প্রতিষ্ঠানের স্থলে রুডলফ রকারের মত আমি চাই 'স্বাধীন সম্প্রদায়সমূহের একটি ফেডারেশন'। রকারের মতে, এই স্বাধীন সম্প্রদায়গুলো পরস্পরের সাথে সাধারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের সূত্রে সম্পর্কিত থাকবে। নিজেদের কর্মকাণ্ডের বন্দোবস্ত করবে পারস্পরিক সম্মতি আর স্বাধীন চুক্তির মাধ্যমে। এই স্বাধীন সম্প্রদায়গুলো প্রত্যেকেই স্ব-ব্যবস্থাপনা ও অংশীদারিত্বমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার নীতিতে বিশ্বাসী হবে। আর যার চিন্তাভাবনা বিচারআচার এমন, আকাঙ্ক্ষা এমন, সে রাষ্ট্রবিরোধী না হয়ে পারে না। আমি কর্তৃত্ব-বিরোধিতার অংশ হিসেবেই রাষ্ট্র বিরোধী।

প্রশ্ন: এই আন্দোলনে যেসব কর্মসূচি পালিত হয়েছে, কাছাকাছি একইরকম কর্মসূচি দিয়ে আগেও অনেক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। তাহলে এই আন্দোলনকে বিশেষভাবে 'অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন' হিসেবে আখ্যায়িত করার কারণ কী?

উত্তর: হ্যাঁ, কাছাকাছি কিন্তু হুবহু একই রকম কর্মসূচি এই আন্দোলনে পালিত হয় নি। মূলত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের যে সেন্টিমেন্ট সেই মাফিকই কর্মসূচিগুলো ঘোষিত ও পালিত হয়েছে। এখন প্রশ্নটা দাঁড়ায় কেন এটাকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন বলা হলো। রাষ্ট্র-রাজনীতির দমনপীড়ণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্র ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। যেমন, ২০০৪ সালের ৩০শে অক্টোবর, ২০০৭ এর ২২ শে আগস্ট'র মতো আরো কিছু ছাত্র বিক্ষোভ সংঘটিত হয় যেখানে খুব বিশেষ মাত্রায় ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ দেখা যায়। এই ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগে বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীকে অংশ নিতে দেখা যায়। প্রতিরোধের এই ভাষা সংগঠিত নয় এবং স্রেফ বিশুদ্ধ গণরোষে ভরা। আবার অসংগঠিত বলেই পরবর্তী সময়ে তা প্রয়োজনমত প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হয়। এছাড়া ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের কারণেই গণরোষের আসল কারণটা চাপা পড়ে যায়। ফলে তা সমর্থনও হারায়। আমরা এই সবকিছু থেকে সতর্ক থাকতে চেয়েছিলাম। সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও বিপুল অংশগ্রহণ হলে সেখানে কোনো ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী যেন হঠাৎ ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ বা ইত্যাকার সহিংসতার হুজুগ তুলে আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে না পারে এইজন্যই আমরা এই আন্দোলনকে 'অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন' হিসেবে সবার সামনে হাজির করি। যেন আন্দোলনের সেন্টিমেন্ট সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকেই সচেতন থাকতে পারে। এই আন্দোলনের এরকম নামকরণের আরো একটি কারণ হচ্ছে বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থী যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতে পারে, দ্বিধাগ্রস্থ না হয়। কেননা বিক্ষোভ মিছিল, ধর্মঘট এধরণের কর্মসূচিতে আপামর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি দেখিনি। আর যে প্রক্রিয়ায় এগুলো হয়ে থাকে তাতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সংযুক্ত হবার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। তাই আমরা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় এমন কর্মসূচিই ঠিক করেছিলাম যেন সবাই অংশ নিতে পারে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, জন-সম্পৃক্ততা। এজন্যই আমরা মানববন্ধন, গণর‍্যালি, দুই ঘন্টা স্বতঃস্ফূর্ত ক্লাস বর্জন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং গণসংযোগে প্রচারপত্র ব্যবহার, আন্দোলনের চিন্তাধারা বোঝার জন্য মুক্ত আলোচনা ও গণসংলাপ ইত্যাদি ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করি। এমনকি এবারের আন্দোলনে সাংস্কৃতিক দিকটিও আলাদা করে চোখে পড়ার মতো। র‍্যালি, মানববন্ধন, সমাবেশ প্রভৃতি কর্মসূচিতে নতুন ধারার গণসঙ্গীত ছাড়াও প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, ব্যানার, ব্যঙ্গচিত্রসহ নানান ধরণের ডেমোনেস্ট্রেশনে সৃজনশীলতার ছাপ দেখা যায়। পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলোতে আমি এমনটা দেখিনি। ফলে এবারের এই 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলন' সবকিছু মিলিয়ে একটি নতুন রূপ ধারণ করেছিল।

প্রশ্ন: আন্দোলনে সাংগঠনিক কাঠামোটা কেমন ছিল, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটা কেমন ছিল, কোনো সমস্যার জায়গা ছিল কিনা, থাকলে সেটা কেমন?

উত্তর: সংগঠন বলতে আমি বুঝি, একটি বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তা বাস্তবায়নের জন্য কিছু মানুষের মধ্যে চিন্তা, সৃজন ও তৎপরতার সংহতি। পারস্পারিক যোগাযোগ ও দায়বদ্ধতাই এই সংহতির প্রধান ভিত্তি। ফলে আমার ধারণায় এবং আমার মতো অনেকেরই ধারণামতে সংগঠন মানে তা ক্রমকর্তৃত্বতন্ত্রমুক্ত একটা জিনিস। এই ক্রমকর্তৃত্বতন্ত্র বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। সাধারণত পলিটিক্যাল পার্টি কিংবা অনান্য প্রতিষ্ঠানে কাজের দায়িত্ব ভাগ করার নামে নানান ধরণের পদ তৈরি করা হয়। এই পদগুলোকে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাও দেয়া হয়। ফলে ক্ষমতার নির্দিষ্টতা অনুসারে উপরতলা-নিচতলা তৈরি হয়। সাধারণত উপরতলার প্রধান ব্যক্তিটি হন সভাপতি আর তারপর ক্রমঅনুসারে সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক প্রভৃতি পদ বিন্যস্ত থাকে। এখানকার সাধারণ সংস্কৃতি হচ্ছে: উপরতলার লোক নিচতলার লোককে হুকুম বা নির্দেশ দেবেন এবং নিচতলার লোক বিনা বাক্যব্যয়ে তা পালন করবেন। আর এটা করতে পারলেই নিচতলার লোক একদিন উপরতলায় যেতে পারবেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে মূলত ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠানের গুটিকয়েক লোকের হাতে ন্যাস্ত হয়ে পড়ে। এবং এই গুটিকয়েক লোক সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠেন। ফলে ক্রমকর্তৃত্বতন্ত্র ক্ষমতার কেন্দ্রানুগতাকেই ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্র-কর্তৃত্বকে জায়েজ করার জন্য নানান ধরণের পলিটিক্যাল পার্টি ঘরানা থেকে 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'র আওয়াজ শোনা যায়। একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' জিনিসটি একটি মিথ। গণতন্ত্র বলতে প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা-সাম্য-সংহতি'র নিশ্চয়তাকে বোঝায়। কিন্তু কেন্দ্র মানেই অসম ক্ষমতা— অপরের উপর কর্তৃত্ব। আর সম্পর্ক যখন কর্তৃত্বমূলক তখন সেখানে সংহতি থাকতে পারে না। সংহতির নামে খুবই নিস্প্রাণ যান্ত্রিক একটা সম্পর্ক টিকে থাকে। ফলে গণতন্ত্র ও কেন্দ্র সমার্থক হতে পারে না। আর এসব চিন্তাকে মাথায় রেখেই আমরা কর্তৃত্ব-বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ এই মঞ্চটিকে সম্পূর্ণরুপে ক্রমকর্তৃত্বতন্ত্রমুক্ত রাখতে চেয়েছি। এই জন্যই সমন্বয় পরিষদে কোনো সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক-আহ্বায়ক ছিল না, প্রত্যেকেই সমান অধিকার সম্পন্ন সদস্য ছিলেন।

প্রশ্ন: এই সমন্বয় পরিষদেরও তো তাহলে একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল...

উত্তর: এই বিশেষ মন্তব্যটি করার আগে মঞ্চের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটি বিবেচনায় রাখার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাব। সমন্বয় পরিষদের সদস্যদের কাজ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের নানান ধরণের মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহ করা। অতঃপর সেই মতামত ও প্রস্তাবগুলোকে পর্যালোচনা করা, সাথে সাথে নিজেদের চিন্তা-মতামত প্রভৃতি উপস্থাপন করে তর্ক-বিতর্ক-আলোচনার মাধ্যমে সবকিছুর সমন্বয় ঘটিয়ে একটা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা। এই কর্মপরিকল্পনা কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়— প্রস্তাব মাত্র। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা সক্রিয়-আন্তরিক ও মত-সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের নিয়ে একটি সাধারণ বৈঠকে বসে প্রস্তাব আকারে এগুলো হাজির করা হতো। সেখানে বিষয়টি সমর্থিত হলেই কেবল কর্মসূচি হিসেবে বৃহত্তর শিক্ষার্থীসমাজের উদ্দেশ্যে সেটা হাজির করা হতো। সকল কর্মসূচির ভিত্তিই ছিল স্বতঃস্ফূর্ততা। বলপ্রয়োগমুলকভাবে কোনো কর্মসূচি পালন করা হতো না। যেমন আন্দোলনের সময় দুই ঘন্টা ক্লাস বর্জন। আমরা এই কর্মসূচি পালনের জন্য শুধু প্রচার চালিয়েছি। কোনো ক্লাসরুমে উপস্থিত হয়ে ক্লাস বন্ধ করতে বলিনি। তবে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে চাইছেন না কিন্তু শিক্ষক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ক্লাস করতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করছেন, শুধু এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে আমরা প্রতিরোধ গড়ব— এমন পরিকল্পনা আমাদের ছিল। কিন্তু তা প্রয়োগের প্রয়োজনই পড়ে নি। ফলে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটা কোনো কেন্দ্রের হাতে বন্দী ছিল না। এটা একটা প্রবাহের মতো বিষয় হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সমন্বয় পরিষদ আলাদা কোনো বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করার মতো কাঠামোই ছিল না।

প্রশ্ন: কিছু কিছু সময়ে দেখা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবেও কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার পড়ে। সেক্ষেত্রে কী হতো?

উত্তর: তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কী হবে সেইটা নিয়ে আমি নিজেই শঙ্কিত

ছিলাম। কেননা হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে সমন্বয় পরিষদের সদস্যদের তাৎক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা তো খুবই কঠিন। যদি সমন্বয় পরিষদ ছোট ছোট কিছু একটিভিস্ট গ্রুপ কিংবা ক্যাটালিস্ট গ্রুপের একটা ফেডারেশন হতো এবং এদের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সমন্বয় পরিষদ গড়ে উঠত তাহলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটা কঠিন হতো না। আর যেহেতু সাধারণ সভায় বেঁধে দেয়া গাইডলাইনের বাইরে সমন্বয় পরিষদের প্রতিনিধিরা কোনো বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত নিতে পারতো না সেহেতু প্রতিনিধিরা 'ব্লাংক চেক প্রাপ্ত' বা স্বেচ্ছাচারী হওয়ার কোনো সুযোগ থাকতো না। কিন্তু মঞ্চের সমন্বয় পরিষদে এরকম একটিভিস্ট গ্রুপ না থাকলেও কতকগুলো পক্ষ ছিল। এই পক্ষগুলোর মধ্যে যারা সমন্বয় পরিষদে ছিলেন তাদের মধ্যে থেকে বিশেষ দু-একজন করে মত-সংগঠকরা কোনো তাৎক্ষণিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে অন্য পক্ষের মত-সংগঠকদের সাথে আলোচনা করে নিজ নিজ পক্ষগুলোর সাথে কথা বলে নিতেন। তবে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটা কেমন হবে— এ বিষয়ে কোনো জমাট ধারণা আমার কিংবা মঞ্চের অন্য অনেক সদস্যেরই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এটা নির্ধারিত হবে এমন একটা ভাবনাই আমার ছিল এবং বর্তমানে আমার উপলব্ধি হচ্ছে কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন (সমন্বয় পরিষদকে কতকগুলো একটিভিস্ট গ্রুপের একটা ফেডারেশন হিসেবে গড়ে তোলা) আনলেই এই ধরণের সমস্যাগুলো আমরা উত্তরণ করতে পারি।

প্রশ্ন: সমন্বয় পরিষদের সদস্যদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে দ্বিমত হলে তখন কী ভোটাভোটি হতো?

উত্তর: আমাদের আশপাশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠের হ্যাঁ অথবা না মতকে বোঝার সংস্কৃতি দাঁড় হয়েছে। আপনি যেটাকে ভোটাভোটি বললেন। এ ধরণের পদ্ধতির একটা বড় দুর্বলতা হলো, এটা বিতর্ককে এড়িয়ে যেতে চায়। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের সাথে একমত না হলেও সংখ্যালঘিষ্ঠকে অনুগত'র মতো তা বাস্ত বায়ন করতে হয়। ঐ মতামত নিয়ে জনসংযোগের সময়ে যদি কোনো ব্যক্তি সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতটির সাথে ঐক্যমত্য হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে আর জনসংযোগকারী যদি হন সংখ্যালঘিষ্ঠ তবে তিনি খুব বড় ধরণের সমস্যায় পড়েন। এছাড়া যে মতের সাথে একজন একমত নয় সেই মত বাস্তবায়ন করা তার জন্য মানসিক চাপ। এটা প্রায় একটা স্বাধীনতা হরণকারী প্রক্রিয়া। এজন্য মঞ্চের সমন্বয় পরিষদে কোনো বিষয়ে একাধিক মত থাকলে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে তা ফয়সালা করার চেষ্টা হতো। একটা বিষয়ের উপর ঘন্টা দুই-তিনেক আলাপ-আলোচনার নজির এই সমন্বয় পরিষদের ছিল। তীব্র তর্ক-বিতর্ক এখানে সংঘটিত হয়েছে। এর পরেও একমত না হতে পারলে উদ্ভুত সকল মতামত আন্দোলনকারীদের সাধারণ বৈঠকে উপস্থাপন করা হতো। সাধারণ বৈঠকের মধ্যেও তর্ক-বিতর্ক-আলোচনার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এর পরেও কোনো কারণে ঐক্যমত্য না হলে ঐ বিশেষ ইস্যু বা কর্মসূচি পর্যন্ত যে কোনো সদস্য নিজের নাম প্রত্যাহার করতে পারতেন। এমনকি জনসম্মুখে ইস্যু বা কর্মসূচির ক্ষেত্রে ভিন্নমত প্রচারের ও সেই মাফিক তৎপরতা চালানোর সুযোগ ছিল। এ প্রক্রিয়ায় এখানে সংগঠক-সক্রিয়কের স্বাধীনতা সংরক্ষিত ছিল। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে, যেমন, ক্লাস আওয়ারে মাইক ব্যবহার কিংবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল একাডেমিক কার্যক্রম বয়কট (এই কর্মসূচি পালনের প্রয়োজন পড়ে নি, তার আগেই শিক্ষার্থীরা মুক্তি পেয়ে যায়।) এইসব সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি বিষয়ে দ্বিমত ছিল। কিন্তু ক্লাস বর্জন কর্মসূচি শুরু হলে এবং বৃহৎ সমাবেশে বক্তব্য পৌঁছানোর জন্য মাইক ব্যবহার বিষয়ে দ্বিমতটি আর ছিল না। আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল একাডেমিক কার্যক্রম বয়কট কর্মসূচিটিতে দুই-তিন জন সমন্বয় পরিষদ সদস্য দ্বিমত পোষণ করেছিলেন এবং কর্মসূচিতে অংশ নেবেন না বলেও জানিয়েছিলেন। সমন্বয় পরিষদের অন্য সদস্যরা তাদের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

প্রশ্ন: কিন্তু কোনো ইস্যু বা কর্মসূচি নিয়ে দুই তিনটা মত প্রচার ও সেই মাফিক তৎপরতা চালালে মঞ্চের ভেতরে একটা বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয় না? আবার যখন মানুষ দেখবে যে একই ব্যানার নিয়ে দুই-তিন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে তখন কী বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে না?

উত্তর: না, বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয় না। কেননা বৃহত্তর মূলনীতিতে লড়াইটা অনায্য কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। ফলে একাধিক ধরণের কর্মসূচি শেষ বিচারে সমান্তরাল চাপই তৈরি করে। ফলে সেখানেও একটি ঐক্য তৈরি হয়। প্রকৃতপক্ষে একই নামের কিন্তু আলাদা মতের একাধিক ব্যানার থাকলে জনগণ যে মতটি সমর্থন করে সে তাতেই অংশ নেয়। ফলে নামের অন্ধ অনুসরণ নয় বরং মতামত ও বক্তব্যের ভিত্তিতে সমর্থন ও অংশগ্রহণ এই বিষয়টিই এর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু একটা নামকে-একটা ব্যানারকে অন্ধ অনুসরণ— মূলত এরকম কোনো অবস্থান থেকে বিভ্রান্তির সমস্যাটা দেখা দিতে পারে। একজন যদি এটা ঠিক করে ফেলে যে, তিনি সবসময়ই এই নামটাকে-এই ব্যানারটাকেই সমর্থন করবেন তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রথমত নাম-ব্যানারের অন্ধ প্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং যাচাই বাছাই ছাড়াই নির্বিচারে ব্যানারের সিদ্ধান্ত মানতে থাকেন। ফলে তিনি বিভ্রান্ত হন। *কর্তৃত্ব-বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ* মঞ্চ এরকম সমস্যার মধ্যে পড়ে নি। তাই আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি অভিজ্ঞতার অবস্থান থেকে দিতে পারছি না। সাধারণ যুক্তি চর্চার অবস্থান থেকেই আমি এরকমভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করছি।

প্রশ্ন: *কর্তৃত্ব-বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ* মঞ্চের আন্দোলন শুরুর কয়েক দিন পরেই আমরা দেখলাম যে সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ঘোষণাকারী *নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ* নামে আরেকটি ব্যানার থেকে আন্দোলন শুরু করা হয়। আন্দোলনের সময় এই দুই মঞ্চের সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তর: প্রকৃতপক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো ২০০২ সালে শিবির-বিরোধী আন্দোলনের সময় নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এই মঞ্চটি প্রতিষ্ঠা করে।ঐ একই সময়ে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রী নির্যাতন, বুয়েটে সনি হত্যাকাণ্ড এসব কিছু মিলিয়ে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মঞ্চটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আগেই আত্মপ্রকাশ করে। এই মঞ্চটি সাধারণ শিক্ষার্থীদের দ্বারা সংগঠিত কোনো মঞ্চ নয়। মূলত বাম ছাত্র সংগঠনগুলো দ্বারা সংগঠিত এবং কিছু সচেতন সাধারণ শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় ঐ সময়ে এ মঞ্চটি গড়ে উঠেছিল। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক আন্দোলন সংগঠিত হলেও কখনোই এ মঞ্চের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় নি। কিন্তু সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময়ে এই মঞ্চটি আবার দেখা যায়। এবার এই মঞ্চটি গঠন প্রক্রিয়ায় প্রধানত ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন যুক্ত ছিল। তাদের দিক থেকে এরকম একটা মঞ্চ গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আমি কিছুটা অনুমান করতে পারি। ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি করতে করতে শিক্ষার্থীদের থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আবার রাজনৈতিক দলের অংশ হিসেবে দলের মতাদর্শকে তারা ধারণ করে। এই মতাদর্শ একজন সাধারণ শিক্ষার্থী নাও ধারণ করতে পারে। তখন ঐ সাধারণ শিক্ষার্থী সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে একমত হলেও স্রেফ ঐ মতাদর্শের কারণেই ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে একাত্মতা বোধ করে না। ফলে ছাত্র সংগঠনগুলোকে কলস পাল্টাতে হয়। ছাত্র সংগঠনগুলো কলস পাল্টে এরকম মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে। এসব মঞ্চ প্রতিষ্ঠার পেছনে সত্যিকারই আন্দোলনের স্পিরিটের চেয়ে, কিংবা কিছু সাধারণ শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ, পরবর্তীতে সংগঠন করানো ইত্যাদি বিষয়ই মুখ্য হয়ে পড়ে। ফলে একটা সত্যিকারের আন্দোলন গড়ে ওঠা এবং তা থেকে প্রগতিশীল অর্জনগুলো সংঘটিত হয় না। আবার ছাত্র সংগঠনের নিয়ন্ত্রণাধীন বলেই এই মঞ্চগুলোরও কাজের ধাঁচ অনেকটা ছাত্র সংগঠনগুলোর মতোই কেন্দ্র মুখাপেক্ষী। সেজন্যই এখানকার বাস্তব অবস্থা বিচারের চোখ কিংবা বলতে পারি, যে ধরণের চিন্তা ও যুক্তি চর্চার মধ্যে থাকলে বাস্তব অবস্থা বিচার করা যায় তা তাদের ছিল না। এখানে এই মঞ্চটি সংগঠিত করার পেছনে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে কিছু সাধারণ শিক্ষার্থীদের নামানোর একটা প্রচেষ্টা ছিল। আর অপরদিকে আমাদের মূলনীতির জায়গাটি ছিল: নিয়ন্ত্রণ নয়, শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। ফলে দৃষ্টিভঙ্গিগত অবস্থান এবং সাংগঠনিক সেটিং-এর কারণেই বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো এই মঞ্চটি গঠন করে। কিন্তু ততদিনে আন্দোলনের প্রধান ধারা হিসেবে *কর্তৃত্ব-বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ* মঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই আন্দোলনের প্রধান ধারার কর্মসূচির সাথে তারা একাত্মতা ঘোষণা করে এবং নিজেরা ছোটখাট দু-তিনটি কর্মসূচি পালন করে। তাদের এই কর্মসূচিগুলোতে আমরা সামগ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনকে দ্বিধা-বিভক্ত করতে পারে নি। বরং সামগ্রিক আন্দোলনে কিছু অবদান রেখেছে। আবার ঐ মঞ্চটি দাঁড় হওয়ায় আন্দোলনের কর্তৃত্ব-বিরোধী ধারার আলাদা পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন: আন্দোলনের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনাকে দেখা গেছে সমাবেশে, র‍্যালিতে বক্তব্য রাখতে, কর্মসূচি ঘোষণা করতে। এ থেকে অনেক শিক্ষার্থীরই হয়তো এমন ধারণা জন্মেছে যে, আপনি এই আন্দোলনের নেতা। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী? আন্দোলনের নেতৃত্ব বিষয়টিকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন আপনি?

উত্তর: হ্যাঁ, এটা দিনের আলোর মতো পরিস্কার যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি সমাবেশে, র‍্যালিতে কিংবা মানববন্ধনে বক্তব্য রাখতাম। এবং পরবর্তী দিনের কর্মসূচীও ঘোষণা করতাম। প্রচলিত সংস্কৃতিতে এরকম একটা ধারণা আছে যে, যিনি সমাবেশে বক্তৃতা করেন তিনিই নেতা এবং নেতাই সামগ্রিক আন্দোলনের ভাগ্য বিধাতা। এ কারণে অনেক শিক্ষার্থীরই মনে হয়েছে যে, আমি এই আন্দোলনের নেতা। এই বিষয়টি আমাকেই সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত করে তোলে। আমি আন্দোলনের সময়ই এ বিষয়ে সমন্বয় পরিষদের অনান্য সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এবং অন্যদেরকে ক্রমঅনুসারে এই কাজটির দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাবও রাখি। সেই মাফিক অন্যদের অনুরোধে দু-একজন সেই চেষ্টাটা করেন। কিন্তু মঞ্চের সামগ্রিক বক্তব্য ও ধারণা স্পষ্ট করে বলতে পারার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে— এ কথা বলে তারা পরবর্তীতে সেই দায়িত্ব নিতে চান নি এবং তারপরে কেউই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কাজটির দায়িত্ব নিতে আগ্রহী ছিলেন না। আবার বিশেষ দু-একজনের ক্ষেত্রে অন্যদের তীব্রতর আপত্তি ছিল এবং তাদের আপত্তির যুক্তি সমন্বয় পরিষদে সমর্থিত হয়। তখন আমার প্রস্তাব ছিল যে, যেমনই হোক না কেন মঞ্চের অনান্য সদস্যরা বক্তব্য রাখবেন, কোনো সংশোধন বা সংযোজন থাকলে আমি তা পরে যুক্ত করব। কিন্তু এই কাজের জন্যও লোক পাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। ফলে মঞ্চের

সিদ্ধান্তে কর্মসূচিগুলোতে আমি বক্তব্য রাখি। তবে নিজের মনগড়া এবং সমন্বয় পরিষদের অনান্য সদস্যদের দ্বিমত আছে এমন কোনো বক্তব্য দেয়ার এখতিয়ার আমার ছিল না। মঞ্চের লিফলেট, সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য, বিভিন্ন সভায় সমন্বয় পরিষদের সদস্যদের দ্বারা সমর্থিত চিন্তা-ধ্যানধারণা অনুযায়ী বা একই ধ্যানধারণাই কিন্তু ভিন্ন ভাষায় আমি বক্তব্য উপস্থাপন করতাম। ফলে আমার কাজটা ছিল অনেকটা মুখপাত্রের মতো। দু-তিনবার বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি মঞ্চের গাইডলাইনের বাইরে চলে যাই। মঞ্চের অন্যান্য সদস্যরা এ বিষয়ে আমাকে সতর্ক করে দেন। আমি আমার ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি। সুতরাং আমি খুবই স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, আমি কোনোভাবেই এই আন্দোলনের ভাগ্যবিধাতা— নেতা নই। আন্দোলন চলাকালে মিডিয়ার সামনেও আমি এই বক্তব্যই দিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিবেকেই ছিল এই আন্দোলনের নের্তৃত্ব।

একটি আন্দোলন গড়ে ওঠার পেছনে থাকে বহুদিনের চিন্তাভাবনা ও অনুশীলন। বহুদিন ধরে এই চিন্তাভাবনা ও অনুশীলনগুলোর সারাংশ করা, ব্যাখ্যা প্রদান করা, প্রচার করা এবং জনগণের মধ্যে আন্দোলনের নায্যতার পক্ষে হরহামেশা বক্তব্য উপস্থাপন করার কাজগুলো কোনো না চিন্তাধারায় মত-সংগঠকরাই করে থাকে। এই মত-সংগঠকরা কখনো খুবই সুসংগঠিত, কখনো আবার স্রেফ একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে বিস্তৃত থাকে। আর তাদের চিন্তাভাবনা ও অনুশীলন যদি জনগণের কাছে ন্যায্য বলে মনে হয়, তখনই কেবল তাতে জনসম্পৃক্ততা তৈরি হয়। ফলে কোনো আন্দোলন শুধু এই মত-সংগঠকদের উপর নির্ভরশীল বিষয় নয়। এর প্রধান বিষয়টিই হচ্ছে জনসম্পৃক্ততা। কোনো একটি গোষ্ঠীর কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলা, আন্দোলন সৃষ্টি করে না। আন্দোলন তখনই সৃষ্টি হয় যখন তাতে জনসম্পৃক্ততা ঘটে। ফলে নেতৃত্ব বিষয়টিকে আমি ব্যাখ্যা করি মত-সংগঠক ও জনসম্পৃক্ততা— এই দুইটি বিষয়ের একটি যুগপৎ সম্পর্ক হিসেবে। কিন্তু মিডিয়া এবং ইতিহাস লেখার যে ছক আছে তাতে প্রায়ই নেতৃত্ব বলতে মত-সংগঠকদের মধ্য থেকে হাতে গোনা এবং জনস্রোতের মধ্যে ভেসে থাকা দু-চার জন লোককে বোঝানো হয়। ফলে এই প্রক্রিয়ায় নের্তৃত্বের যে ধারণা নির্মাণ করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে গণমুখী অর্থ ধারণ করে না।

প্রশ্ন: যে কোনো কাজ সম্পন্ন করার পরেই তো সেটা নিয়ে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা হয়। আমরা সেখান থেকে কিছু শিখতে পারি। এবারের আন্দোলনের পর আপনার অভিজ্ঞতা কী? কী শিখলেন আপনি?

উত্তর: আন্দোলন হচ্ছে জীবন শিক্ষার সবচেয়ে বড় পাঠশালা। ফলে এবারের আন্দোলনেরও কিছু শিক্ষা আছে। আমি এই আন্দোলন থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় শিখেছি। আমি প্রথমত শিখেছি জনসম্পৃক্ততাই একটি আন্দোলনের প্রধান বিষয়। ফলে তাই ঘটে যা ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণ চায়। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা শুধু অর্জন করলেই চলে না, তা পাহারা দিয়ে টিকিয়ে রাখতে হয়। তৃতীয়ত, বিবেক যখন আন্দোলনের নের্তৃত্ব তখন রাষ্ট্র ও অনান্য ক্ষমতাশক্তির প্রচার-প্রচারণা ধুলিস্যাৎ হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন: শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মুক্তি ছাড়া এই আন্দোলনে এমন কী অর্জিত হয়েছিল যার কারণে এই আন্দোলনকে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন: জরুরী পর্ব নামে আখ্যায়িত করলেন?

উত্তর: সাম্প্রতিক আন্দোলন শুধু শিক্ষক-শিক্ষার্থী মুক্তির আন্দোলন না। এই আন্দোলন রাষ্ট্র ও অনান্য দাপুটে আধিপত্যশীল ক্ষমতার বিরুদ্ধে তথা বৃহত্তর অর্থে অনায্য-অগণতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন। তাই রাষ্ট্রের জরুরী আইন ভঙ্গ করে জরুরী প্রতিবাদ, জরুরী প্রতিরোধ এই আন্দোলনের মাধ্যমে সংঘঠিত হয়েছে। জরুরী আইনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কর্তৃত্বের শুঁড় ঢুকেছিল, তা থেঁতলে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জরুরী অবস্থা শিথিল হয়ে গেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নানান ধরণের তৎপরতা প্রকাশ্যে সংগঠিত হতে পারছে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বপরায়ন প্রক্টরিয়াল আইনের বিধিনিষেধগুলো দূর্বল হয়ে গেছে, যার কারণে আন্দোলনের এই মঞ্চ থেকে যখন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার উপর, যে নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল তা অমান্য করার ঘোষণা দেয়া হয়, তারপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ আলোচনা সভা, সেমিনার, পাঠচক্র, প্রদর্শনী, উৎসব প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের অনুমোদন দেয়া শুরু করে। জরুরী অবস্থার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্র কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোটভুক্ত সংগঠনগুলো সাংস্কৃতিক তৎপরতা চালাতে পারছিল না, তৎপরতাহীনতার কারণে ক্রমেই সদস্যহীন হয়ে পড়ছিল। আন্দোলনের পরে সেই সংগঠনগুলো যেন প্রাণ ফিরে পায়। আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট ঐক্যের শক্তি, রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সবসময় চাপের মুখে রাখছে। এতে জরুরী অবস্থার মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার সীমা প্রসারিত হয়েছে।

এই আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এই আন্দোলন আত্মপরিচয় নির্মাণের আন্দোলন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা আন্দোলনের জঠর থেকে জন্ম নেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনাকাঙ্খিত পরিচয় নির্মিত হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মানেই মৌলবাদী, প্রতিবাদহীন, সহিংস কিংবা অনাধুনিক-খ্যাত্ ইত্যাদি। এখানকার তাবৎ প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড মানেই তার স্থান সংবাদপত্রের '১৭ নম্বর পাতা'। কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা আন্দোলনের জঠর থেকে জন্ম নিয়েছে সে বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাহীন নয়। এখানে যেমন শিবির আছে তেমনি মুক্তিকামী প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মীরাও আছেন। ৬০-এর দশকের ছাত্র আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক নবজাগৃতির উত্তরাধিকার এই বিশ্ববিদ্যালয়। তাই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিচয়ের বিরুদ্ধে সত্যিকারের আত্মপরিচয় পুনঃনির্মানের সূচনা ছিল এই আন্দোলন।

এই আন্দোলন যে, শুধু শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মুক্তির আন্দোলন ছিল না, মুক্তচিন্তা ও বিবেকের অধিকার সমুন্নত রাখার আহ্বানও এই আন্দোলনের মধ্যে ছিল তা আন্দোলনের সময়ের প্রচারপত্র-প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন-ব্যানার কিংবা আন্দোলনকারীদের লেখাপত্রের মধ্যে খুবই স্পষ্ট। অনায্য-অগণতান্ত্রিক কর্তৃত্বপরায়ণ ক্ষমতাশক্তি, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা-অধিকারকে সংকুচিত করে ফেলে। আর বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যখন এই ঘটনা ঘটে তখন সামগ্রিক চিন্তা ও সৃজন রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে মুক্তচিন্তা ও বিবেকের অধিকার সমুন্নত রাখার শ্লোগান এই অর্থে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার আকাঙ্ক্ষাকেও ব্যক্ত করে। আবার এই শ্লোগানের মাধ্যমে জরুরী আইনের বিরুদ্ধে জরুরী প্রতিরোধের ন্যায্যতাকেও তুলে ধরা হয়।

এই আন্দোলন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মাধ্যম বিশেষত গণসঙ্গীতের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। খুব বিচ্ছিন্নভাবে এবং ব্যক্তিগত বা বন্ধু পরিমণ্ডলে নতুন ধারার গণসঙ্গীত বা জীবন ঘনিষ্ঠ গানের চর্চা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল। কিন্তু বৃহৎ পরিসরে তা প্রকাশিত ছিল না। এই আন্দোলনের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আন্দোলনের সময়ে র‍্যালি, সমাবেশ, মানববন্ধন প্রভৃতিতে যে গণসঙ্গীতগুলো উচ্চারিত হয়েছে তা ধ্রুপদী গণসঙ্গীতের ধারা যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জোটভুক্ত সংগঠনগুলো চর্চা করে তার থেকে আলাদা। তারুণ্য-স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ কিন্তু তার মাঝেও ঘুড়ে দাঁড়ানোর কথা এই গানগুলোতে ছিল। সংগ্রাম-সংহতি-ভালোবাসা মিলেমিশে একাকার হয়েছে এই গানগুলোতে। এটা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি স্পষ্ট বাঁক।

প্রশ্ন: *কর্তৃত্ব-বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ* মঞ্চের পক্ষ থেকে "একুশ আমার বর্ণমালা" শীর্ষক একুশের মাসব্যাপী কর্মসূচি পালিত হয়। এই কর্মসূচি কতোটা সফল ছিল? মঞ্চের ভবিষ্যৎ কতোটুকু সম্ভবনাময়?

উত্তর: হ্যাঁ, আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী মুক্তির পর মঞ্চের ব্যানারে "একুশ আমার বর্ণমালা" শীর্ষক একুশের মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষিত হয়। বৃহত্তর একটি আন্দোলনের পর সেই আন্দোলনের পর্যালোচনা আগে জরুরী ছিল। কোথায় দুর্বলতা ছিল, কীভাবে আগামী দিনে মঞ্চের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডও পরিধি বিস্তৃত করা যায়, মঞ্চ পরিচালনার ক্ষেত্রে আরো ভালো কি কি পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার সেসব বিষয়ে আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী মুক্তির পর একুশের কর্মসূচি গ্রহণের ব্যাপারে মঞ্চের কিছু সদস্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে আগে মঞ্চের সাংগঠনিক বিষয়টি ফয়সালা করার অনুরোধ জানাই। কিন্তু তারা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে নি। ফলে একুশের কর্মসূচির একটা প্রস্তাবনা তৈরি করে তারা বৈঠক ডাকে। কয়েকবার বৈঠক ডাকার পরেও সাড়া পাওয়া যায় নি। পরে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে বৈঠকে সমন্বয় পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতি আশানুরূপ ছিল না। আমি নিজেও বৈঠকে উপস্থিত হতে পারি নি— হতে যে পারব না তা আগে থেকেই জানিয়েছিলাম। সেই বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের সামনে একটি প্যাকেজ প্রস্তাব আকারে একুশের কর্মসূচি উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাবনার প্রতিটি বিষয়ের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বৈঠকে বিশদভাবে আলোচিত হয় নি বলে উপস্থিত অনেক সদস্যই আমাকে জানিয়েছেন। আবার দীর্ঘ আন্দোলনের সময়ে মঞ্চের সংগঠকদের ক্লাস পরীক্ষা বা একাডেমিক কার্যক্রমে যতটুকু ফাঁক তৈরি হয়েছিল তা পুষিয়ে নেবার জন্য আন্দোলন পরবর্তী সময়ে তাদের একটি বিশেষ ব্যস্ততাও তৈরি হয়। সেই ব্যস্ততার মাঝে কে কতখানি সময় দিতে পারবে তা বৈঠকে পূর্ণাঙ্গরূপে আলোচনা হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু

তা হয় নি। ফলে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নেয়ার বিষয়টি সুচারু ছিল না। সামগ্রিকভাবে কর্মসূচি গ্রহণ প্রক্রিয়াটাতেই অংশিদারিত্বের অভাব ছিল। ফলে মঞ্চের খুবই হাতে গোণা, বলতে গেলে ৫/৭ জন সদস্য এতে সময় দেয়। কিন্তু এই ৫/৭ জনের মধ্যেও সমন্বয় ও সহনশীলতার অভাব ছিল। এতে করে, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে একুশের কর্মসূচির প্রস্তাবনা হাজির হয়েছিল তাতে সফলতার পরিমাণ খুব বেশি বলে দাবি করা যাবে না। মাসব্যাপী কর্মসূচি হাতে নেয়া হলেও পরের দিকের কিছু কর্মসূচি পালিত হয় নি। কর্মসূচিগুলোর মধ্যে আলোচনা সভাগুলোতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। আবার অংশগ্রহণ কম হওয়ায় প্রশাসনের চাপও বাড়তে থাকে। ফলে সবকিছু মিলিয়ে মঞ্চের জন্য সময়টা খুব খারাপ ছিল। তবে প্রশাসনকে স্রেফ অবহিত করে মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করায় প্রশাসন অন্য অনেক সংগঠনকে কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেয়। মঞ্চের একুশের কর্মসূচির প্রচারপত্র এবং তার আবেদন অন্য অনেক সংগঠনকেই কর্মসূচি গ্রহণের ব্যাপারে উজ্জীবিত করে। একারণেই সারা দেশের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এদিক থেকে এটা একটা বড় অর্জন।

মঞ্চের ভবিষ্যত কতটুকু সম্ভবনাময় এবং কতটুকু নয় তা নির্ভর করছে প্রধানত মঞ্চের কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের উপর। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ তখনই সম্ভব হবে যখন মঞ্চের মত-সংগঠকরা মঞ্চের মৌলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে জনমত গঠনে সফল হতে পারবেন এবং মঞ্চের চিন্তাভাবনা ও কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হবে। বর্তমানে মঞ্চের মত-সংগঠকদের মধ্যেই কাজের একটা সমন্বয়ের অভাব দেখা যাচ্ছে। আবার তা কাটিয়ে ওঠার কিছু প্রচেষ্টাও আমি দেখতে পাচ্ছি। তবে আশার কথা হলো এই যে, কর্তৃত্ব-বিরোধী তৎপরতা থেমে নেই। মঞ্চের মত সংগঠকদের মধ্যে অনেকেই কর্তৃত্ব-বিরোধী ধারায় ছোট ছোট একটিভিস্ট গ্রুপ, ক্যাটালিস্ট গ্রুপ কিংবা কনসেন্ট অরগানাইজিং গ্রুপ গড়ে তুলছেন। এদের মধ্যে কেউ ক্ষমতা-মিডিয়া-সক্রিয়তা বিষয়ে, কেউ কর্পোরেট একচেটিয়া ও অসম বাণিজ্যের বিরুদ্ধে, কেউ ভাষা-সংস্কৃতি-আধিপত্য বিষয়ে, কেউ কর্তৃত্ব-আইন-মানবাধিকার বিষয়ে আবার কেউ প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও বিবর্তন বিষয়ে কর্তৃত্ব-বিরোধী ধারায় চিন্তা ও চর্চার জন্য নানান ধরণের তৎপরতার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ফলে এই সংগঠন-প্রচেষ্টাগুলো মোটামুটি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় হতে পারলেই *কর্তৃত্ব-বিরোধী* মঞ্চ'র ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি সংশয় প্রকাশ করার প্রয়োজন পড়বে না।

প্রশ্ন: মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন: জরুরী পর্ব— এ, ঠিক এই সময়ের করনীয় কী বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: ইতিমধ্যে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তার একটি বিশেষ উচ্চারণ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা। এই আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক কী হওয়া দরকার সে বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ফলে এই সময়ে আন্দোলনের প্রধান এলাকাটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে কাঠামোগতভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কেন্দ্র-কর্তৃত্বকে খর্ব করে বিভাগগুলোতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা। সেই সাথে বিভাগীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

বর্তমানে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের কথা শোনা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একটা সংস্কার প্রস্তাব মঞ্জুরি কমিশন তৈরি করেছে। এই সংস্কারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃতপক্ষে কর্পোরেট কর্তৃত্বতন্ত্রের উপযোগী মতাদর্শিক এবং একই সাথে ঐ কর্পোরেটের উৎপাদন কাঠামোতে উন্নতমানের আমলা-কামলা সরবরাহের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাওয়া হচ্ছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা বিরোধী এই কর্পোরেট কর্তৃত্ব তাড়িত সংস্কারকে প্রতিরোধ করা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনে জরুরী কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

০৭ মার্চ-২৮ মার্চ, ০৮
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরায়ন:
'নিপাট মূক-ভাষাহীন-মৌলবাদী' প্রতিকৃতির ময়না-তদন্ত

রেজাউর রহমান বাবু, সারোয়ার হোসেন সুমন, গোলাম রাব্বানী, মেহেদী হাসান প্রান্ত,
রীমা পারভীন, মোহম্মদ আলী রুবেল, আরিফ রেজা মাহমুদ টিটো

'বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান চর্চার পবিত্র তীর্থ।' তাই একদিন আমরাও স্বপ্ন দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। অনেক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ঝক্কিঝামেলা পার করে আমরা ভর্তি হই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগেই আমাদের কিছু বন্ধু-বান্ধব-শুভানুধ্যায়ী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আমাদের 'সতর্ক করে দেয়। 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির আছে। মৌলবাদী সন্ত্রাসের আখড়া ওটা'— এই ধরনের সতর্কবাণীতে সেদিন খুব বেশি কাজ হয় নি। কেননা ছাত্র হিসেবে নিজের বাস্তব অবস্থা, অপর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষার সামনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। ফলে আমরাও অনেকের মতোই এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্য হয়ে যাই।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমাদের যে স্বপ্ন ছিল তা আহত হয়। আমার দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ও কোনো মুক্ত ক্ষেত্র নয়। স্বায়ত্তশাসনের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আয়ত্তশাসন। রাষ্ট্র-রাজনীতির কর্তৃত্বের শুঁড় বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘুরয়ে পেঁচিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণের একটি নমুনা হচ্ছে, জাতীয় রাজনীতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় রাজনৈতিক দল পাল্টে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা উপাচার্যও পাল্টে যান। তখন 'স্বায়ত্তশাসন' '৭৩ এর অধ্যাদেশ' 'বিশ্বজ্ঞান' কথাগুলো যে ফাঁকা বুলি তা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু এ সমস্যা শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও এই সমস্যা আছে। তাহলে আলাদা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালকে 'শিবির আছে' বলে চিনিয়ে দেয়া কেন? সমস্যাটা কি শুধুই শিবির নাকি কর্তৃত্ব? রাষ্ট্র ও রাজনীতির কর্তৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় কখনো প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্র নামে, কখনো শিবির নামে, কখনো কর্পোরেট নামে, কখনো অপারপর ছাত্র সংগঠনগুলোর আধিপত্যের নামে জারি থাকে। ফলে সমস্যা হিসেবে শুধু শিবিরকে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে আসলে অন্যান্য কর্তৃত্বগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এই অন্যান্য কর্তৃত্বগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার কারণেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা করে একটা পরিচয় নির্মিত হয়েছে। এই পরিচয়টা কী, কেমন করে নির্মিত হয় এই পরিচয়, কে নির্মাণ করে, এই পরিচয়ই কি শেষ কথা?— ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা আমাদের জন্য কর্তব্য আকারে হাজির হয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা আন্দোলনের জঠর থেকে জন্ম নেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু পত্রিকার পাতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রতিকৃতি নির্মাণ করা হয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে ধারণা চর্চা করা হয় তা হচ্ছে: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মানেই মৌলবাদী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মানেই সহিংস। নিপাট মূক-ভাষাহীন-প্রতিবাদহীন বিশ্ববিদ্যালয় হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মানেই আধুনিকতা বর্জিত— 'খ্যা...ত্' বিশ্ববিদ্যালয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কোনো ইতিবাচক সংবাদ মানেই তার স্থান পত্রিকার পাতার '১৭ নম্বর পৃষ্ঠা'য়। কিন্তু কেন এই পরিচয়? ক্ষমতার বিন্যাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়ের অবস্থান 'অপর' বা 'প্রান্ত' বলে?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিচয় নির্মিত হয়েছে প্রধানত ক্ষমতা-তাড়িত কর্পোরেট মিডিয়ার দ্বারা। ক্ষমতা-তাড়িত এই কর্পোরেট মিডিয়ার মালিকানা, মুনাফার নেশা, বিজ্ঞাপন বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, অপরাপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে তার সম্পর্ক এবং এই কাঠামোর মধ্য দিয়ে যে সংবাদ উৎপাদন হয় তার চরিত্র প্রভৃতি বিষয়ই ঠিক করে দেয় মিডিয়ায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিকৃতি কী হবে। প্রিয় পাঠক, আমাদের দেশেও মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো একটা বৃহৎ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান কিংবা তার নিগড়ে গড়ে ওঠা বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। ফলে আর পাঁচটা ব্যবসায়ী-কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মতো সেও বিদ্যমান ক্ষমতার বিন্যাসে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ। পুঁজিবাদের মধ্যে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের যে চরিত্র দাঁড়ায় তা থেকে এই মিডিয়া প্রতিষ্ঠান আলাদা কিছু না। ফলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ম-নীতিগুলোকে সে কোন ভাবেই অতিক্রম করতে পারে না। তাই বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামো যা ঐ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ম্যানেজারিয়াল সিস্টেম পরিচালনার আইনগত অথোরিটি, তার সাথে বৃহত্তর নীতিতে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের কোনো বিরোধ থাকে না। বরং পুঁজবাদী প্রথা প্রতিষ্ঠানগুলো কিংবা রাষ্ট্রের ম্যানেজারিয়াল সিস্টেম কতটা নিখুঁতভাবে গড়ে তোলা যায় কিংবা নিখুঁতভাবে চলতে পারে তার জন্য প্রচার-প্রচারণা চালায় মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে রাষ্ট্র ও কর্পোরেট ক্ষমতার স্বার্থে মিডিয়া প্রতিষ্ঠান ভাবাদর্শ উৎপাদন করতে থাকে। জনগণের মনে-মগজে রাষ্ট্র ও কর্পোরেটের পক্ষে সম্মতি উৎপাদন করতে থাকে।

আবার মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো বিজ্ঞাপনের জন্য অপরাপর কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞাপন ছাড়া মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সম্ভব না। ফলে খুবই

সুনির্দিষ্ট বিষয়ে বা নীতির প্রশ্নেও মিডিয়া প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট ক্ষমতার শক্তির পক্ষে দাঁড়ায়। এই কারণে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের বিকাশ কর্পোরেট-শিল্পোৎপাদন, কর্পোরেট-বাজার, কর্পোরেট-রিয়েলস্টেট প্রভৃতির বিকাশের অনুষঙ্গ মাত্র। কর্পোরেট বিকাশের গতিমুখই এই বাজার যুগে নির্ধারণ করে দেয় কোনটা 'কেন্দ্র' আর কোনটা 'প্রান্ত' তথা 'অপর'। কর্পোরেটের ক্ষমতাশক্তি যেখানে বেশি, যেখানে কর্পোরেট শিল্পোৎপাদন ও বাজারের রমরমা এবং যেখানে রাষ্ট্র-রাজনীতির সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণের সাথে কর্পোরেটের সহযোগী কর্তৃত্ব বর্তমান সেটাই ক্ষমতার বিন্যাসে 'কেন্দ্র'। আর কেন্দ্র-কর্তৃত্ব যা কিছুর উপর আরোপিত হয় তাই 'প্রান্ত', তাই 'অপর'। কর্পোরেট বিকাশ অভিমুখ অনুসারে ক্ষমতার এই বিন্যাসে রাজশাহী, রাষ্ট্র-রাজনীতি-কর্পোরেটের 'কেন্দ্র' রাজধানী ঢাকার বিপরীতে, 'অপর' বা 'প্রান্ত'। ফলে সেই একই যুক্তির ধারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'কেন্দ্র' আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'প্রান্ত' তথা 'অপর'।

রাষ্ট্র ও কর্পোরেট-বাহিত ক্ষমতার শক্তিকেন্দ্র তথা রাজধানী হচ্ছে ঢাকা। রাজধানী বলেই বিদ্যমান ক্ষমতার বিন্যাসে জনগণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের 'কেন্দ্র' হচ্ছে ঢাকা। রাষ্ট্রের সকল 'গুরুত্বপূর্ণ' নামধারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতা 'কেন্দ্র' ঢাকায় অবস্থিত। কী সংসদ, কী মন্ত্রিসভা, কী সচিবালয় সকল প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ঢাকায়। আর এসব অবস্থান এবং অবকাঠামো ও যোগাযোগগত সুযোগ-সুবিধার কারণে শিল্প ও বাণিজ্যের মক্কা হচ্ছে ঢাকা। ফলে ঢাকা কর্পোরেটেরও মক্কা। মিডিয়া প্রতিষ্ঠান এই মক্কাকে নিজের চরিত্রগত কারণেই রাজধানী হিসেবে স্বীকার করে নেয়। আবার মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কাঠামোটি ক্রমকর্তৃত্বতান্ত্রিক এবং এর কেন্দ্রশক্তিও থাকে ঢাকায়। ফলে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর চরিত্র অনুসারে মিডিয়ার কাছে রাজশাহী হয়ে পড়ে 'প্রান্ত' তথা 'অপর'। মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর সংবাদ উৎপাদন প্রক্রিয়াটা পুরোদস্তর আমলাতান্ত্রিক।

'...অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মতো সংবাদ-মাধ্যমও সফলভাবে তথ্য সংগ্রহ, সংবাদ কাহিনী নির্মাণ ও প্রকাশের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রক্রিয়া গড়ে তোলে। সেহেতু সংবাদ প্রতিষ্ঠান আমলাতান্ত্রিক চরিত্র পায়। আর সংবাদ হয়ে ওঠে প্রাত্যহিক আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফল।...সাংবাদিকদের বীটগুলো এমনভাবে সাজানো যে তারা সংবাদের বেশির ভাগটাই পায় সরকারী অফিসের সূত্র মারফত।' (আ-আল মামুন: শহরে ঘোলজনা বোম্বেটে/কোনটাকে বলি সংবাদ; **যোগাযোগ**; ৮ম সংখ্যা; ২০০৭)

আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন হিসেবে আমলাতন্ত্রের উপরতলার খবরাখবর, সংবাদ হিসেবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর নিচতলার খবরাখবর কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। ফলে ঢাকা আমলাতন্ত্রের মাথা হিসেবে বেশি প্রধান্য পায় এবং রাজশাহী আমলাতন্ত্রের হাঁটু বলে কম প্রাধান্য পায়। এ কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ কভারেজের মধ্যে পরিমাণগত বিপুল বৈষম্য দেখা দেয়।

সংবাদপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিকৃতি ও তার সম্পর্কে অর্থ চর্চা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিকৃতি ও তার সম্পর্কের অর্থ চর্চার মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান তার কারণ হচ্ছে সংবাদের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি। সংবাদের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি নির্মিত হয় কর্পোরেট সঙ্গায়িত সংস্কৃতির মানদণ্ড ও তার আদলে। কর্পোরেটের ছাঁচে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের কাছে তার চরিত্রের কারণেই 'উন্নত', 'আধুনিক', 'প্রগতিশীল' বলে বিবেচিত হয়। অপরদিকে যে সংস্কৃতি এই কর্পোরেটের সঙ্গায়নের মধ্যে পড়ে না, তার বিকাশে অনুকূল নয় তাই 'অনুন্নত', 'খ্যাত' ও 'মৌলবাদী' বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু কর্পোরেটের সঙ্গায়িত এই সংস্কৃতির প্রধান ঝোঁক ও প্রবণতা হচ্ছে: সমাজের মধ্যে রকমারি পণ্য ব্যবহারের ছদ্ম-বাসনা তৈরি করা— মোদ্দাকথায় পুরো সমাজটাকে 'খাদক সমাজে' রূপান্তর করা। এই মাফিক মানুষের সৃজনশীলতা-শিল্পমূল্য-স্বতঃস্ফূর্ত তৎপরতার স্থলে বাজারি উৎপাদন-বাজারমূল্য এবং বাজার-তাড়িত তৎপরতা কায়েম, কর্পোরেটের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্পোরেট বিকাশের গতিমুখে 'কেন্দ্র' বলে কর্পোরেট সংস্কৃতির পঁচনমুখী চর্চা সেখানে আগেই গড়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একুশ-পহেলা বৈশাখ-বসন্ত উৎসবসহ নানান ধরনের উৎসবে কর্পোরেট স্পন্সরশিপের আধিক্য দেখলে এটা সহজেই বোঝা যায়। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশের প্রতিবেশ ও তার সংস্কৃতিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীকে চরমভাবে কর্পোরেট অনুগামী ও কর্পোরেট ক্যারিয়ারের উপর আগ্রহী ও নির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। ফলে কর্পোরেট মিডিয়ার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ দাঁড়ায় 'উন্নত', 'আধুনিক', 'প্রগতিশীল' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যায় 'সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের সূতিকাগার'। এই 'সকলের' মধ্যে কর্পোরেট যা কিছুকে নির্বাচনযোগ্য মনে করে তাই শুধু অন্তর্ভূক্ত থাকে।

অপরদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্পোরেট বিকাশের গতিমুখে 'প্রান্ত'-এ অবস্থান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের প্রতিবেশে কর্পোরেটের বিপুল প্রভাব থাকলেও সামগ্রিক প্রতিবেশ এখনো কর্পোরেট সংস্কৃতির ছাঁচে গড়ে ওঠে নি। গ্রাম-শহুরে সংস্কৃতির ধ্রুপদী চর্চাগুলো এখানে এখনো বর্তমান। এছাড়া সামন্ত কৃষিসমাজের সংস্কৃতির কৃৎ-কৌশলগুলো এখানে এখনো ক্রিয়াশীল। এগুলোর জড় সমাজের এতো গভীরে প্রোথিত যে, কর্পোরেট তাকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে এখনো ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে এখানে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি কর্পোরেট মিডিয়ার চোখে 'অ-আধুনিক'— 'খ্যাত', 'অনুন্নত' ও 'নিশ্চল'। আবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক ছাত্র-সংগঠনগুলোর মধ্যে শিবিরের আধিপত্য ও শক্তি-সামর্থ্য বেশি। কিন্তু এই আধিপত্য ও শক্তি-সামর্থ্যের ভিত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা নয়। এর ভিত্তি মূলত রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ক্ষমতা। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ ছাত্র সংগঠন আধিপত্য কায়েম করবে তা মূলত নির্ধারিত হয়, রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ক্ষমতার সম্পর্ক ও এজেন্ডার সমরূপতা মাফিক। ফলে 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির আছে' তাই সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়টাই 'মৌলবাদী' এমন সিদ্ধান্ত সেই গ্রহণ করে যার মনে-মগজে কর্পোরেট ক্ষমতার 'যক্ষা বীজ' বিদ্যমান। কারণ ক্ষমতা-তাড়িত চোখ স্রেফ ক্ষমতার 'কেন্দ্র' দেখেই সমগ্রর পরিচয় নির্মাণ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রতিবাদী-প্রতিরোধী তৎপরতা বিদ্যমান আছে। ভাষা আন্দোলনের জঠর থেকে জন্ম নেয়া এই বিশ্ববিদ্যালয় নিপাট মূক ও ভাষাহীন নয়। ষাটের দশকের প্রগতিশীল আন্দোলনের উত্তরাধিকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ই বাংলাদেশের সত্যিকারের প্রগতিশীলতার সবচেয়ে বড় দূর্গ হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু রাষ্ট্র-রাজনীতির ভয়াবহ আগ্রাসনে তা আজ ইতিহাস। কিন্তু সেই প্রগতিশীল আন্দোলনের নির্মাণগুলো এখনো মুছে যায় নি। ফলে এখানে যেমন শিবির আছে, অন্যান্য কর্তৃত্ব আছে, তেমন তার বিরুদ্ধে লড়াইও আছে। সাম্প্রতিক বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা' এই উচ্চারণটির কিন্তু সূতিকাগার ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্র-শিক্ষক মুক্তির আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি মাত্রা সংযুক্ত হয়েছে এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। আন্দোলনের কর্তৃত্ব-বিরোধী ধারার সৃষ্টি এবং তার জনসম্পৃক্ততা অনেক ক্ষেত্রেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনের অর্জনকে ছাড়িয়ে গেছে। তাই আগামীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যিকারের মুক্তিমুখীন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই 'কেন্দ্র'-'প্রান্ত' পরিচয়ের ভেদরেখা মুছে ফেলাই হবে প্রাত্যহিক প্রতিরোধ কর্মীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

লেখক পরিচিতি: লেখকরা সকলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থী ও *ওঙ্কার* পরিচালনা পরিষদের সদস্য।

মানুষখেকো কর্পোরেট!!!

বিপন্ন বৈশাখ! মানুষখেকো কর্পোরেট হানা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায়...। এক এক করে সবই খেলো... আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আমাদের জীবন, আমাদের সংস্কৃতি। অস্তিত্বের শেকড় পচনে পচনে যেন বিষাক্ত। কর্পোরেট স্পন্সর-বিষ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে বাতাসে। আমরা কি এই বাতাসেই শ্বাস নেব? চিরচেনা জমিন, সোঁদামাটির গন্ধ, আমাদের প্রেম– সব বন্ধক দেব?

বাঁ...চ...ব... না?

বিচ্ছিন্ন ভাবনার কোলাজ...

ফারহানা ইয়াসমীন সুমি

প্রাককথন: আজ ২০০৮ সালের মার্চ মাসের ৪ তারিখ। আজ দিনটা হয়তো এই লেখার জন্য আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, কোনো জাদুবলে আজ আমি মরিয়া হয়েছি, হাতে সময় খুব কম। মৈত্রেয়ী নামের একটি শিশুকে আমি লালন করি। বুকের উত্তাপ দিয়ে, মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব অর্থাৎ মনুষত্ব দিয়ে। সে ঘুমিয়ে এই অবসরটা আমায় করে দিল। ও আমার পথপ্রদর্শক, গুরু, প্রতিদিন কতো কী যে আমি শিখি ওর কাছ থেকে। প্রতিদিন ও আমাকে একধাপ করে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেয়, আমাকে আরো বেশি মানুষ হতে উদ্বুদ্ধ করে। আমার খুব কাছে ও ঘুমিয়ে আছে। যতবার ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাচ্ছি অজস্র শব্দমালা আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এতো... কি করে যে আসছে, জানি না। কে বলবে আমি কোনোদিন শখ করেও বা বয়ঃসন্ধির আবেগেও একটি কবিতা লিখি নি। রীতিমতো নিজেকে কথাশিল্পী মনে হচ্ছে! কত কী যে আমার মনে আসছে, এলোমেলো! ঐ আমার এক ব্যারাম। আছে অনেক ভাবনা কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা বুঝি না। কার মধ্যে কী উপমা জুড়ে দিই— অর্থহীন। সেই দৌর্বল্যের জন্য আমি ভাল কথাশিল্পী বা লেখক হতে পারি নি। শুধু ডায়রী লেখার বাহন হয়েছে আমার লেখা। লেখার ক্ষেত্রে শৈশব থেকে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তা হলো প্রেম। শিশুকাল থেকে আমার মধ্যে সহজাত প্রেম প্রকাশ পেত অন্যের উপর মানসিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়ার মাধ্যমে। আর সেখানে আমার বিস্তর চিঠি চালাচালি হতো। আমার লেখা সেইসব চিঠি, খুদে-ভাবুক-বোকা-বুদ্ধিমান-সৃজনশীল, যে জাতেরই প্রেমিক হোক, তারা আরো গভীরভাবে প্রেমে পড়ে যেত। আজ যা লিখছি এও আমার প্রেমের গল্প বা কথা। তবে আজ আর একজন প্রেমিককে উদ্দেশ্য করে লিখছি না। বা ডায়রী বন্দী হয়ে ডুকরে কাঁদবে না এই লেখা। এ লেখার জন্য আমি মনে মনে উৎসর্গ করছি আমার বন্ধু আর নিশ্চয়ই প্রেমিক টিটোকে। তো একটু বলেই নিই কেন... দুদিন আগে টিটো আমাকে হঠাৎ বলল, তোমাকে একজন সাদা-সিধে মানুষের দেখা থেকে আমাদের কাজকর্ম- সবকিছু যা তোমাকে বিদ্ধ করে, ভাবায়, হাসায়, কাঁদায়, নাড়া দেয়— তা নিয়ে কিছু লিখ তো, সত্যিসত্যি। সময় সাতদিন। আমি কেন জানি লোভে পড়ে গেলাম। সত্যি আমার লিখতে হবে। টিটোকে ধন্যবাদ ও আমাকে নাড়া দিল বলে, কারণ ওর শুধু মনে করিয়ে দেয়ায় আমি তো হতভম্ব। এতে তো, আমার আত্মপীড়ণ হবার কথা ছিল, কীভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে এতদিন কাটালাম। আমি আজ তাই লিখছি, সম্পূর্ণ নিজের তাগিদে।

১ ॥ দিন তারিখ মনে থাকে না একদম, তাই দিন উল্লেখ করে বলতে পারব না। তবে আগস্টের মাঝামাঝি কোনো এক দিনের কথা। আমি একটা স্কুলে পড়াই, সেই সংক্রান্ত একটি কাজে ভীষণ ব্যস্ত। রাতে হঠাৎ জানলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কী সব ঝামেলা হচ্ছে, খবরে কয়েক পলক বিক্ষিপ্ত ভিডিও ফুটেজ দেখলাম তার। উপলব্ধি করলাম ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ। ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ মানেই কেন জানি আমিও মনে মনে হঠাৎ ছাত্র হয়ে গেলাম। কিন্তু জ্ঞান-বোঝাপড়া সীমিত বলে সবকিছু ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারলাম না, তাই ভেতরে ভেতরে অশান্ত থাকলাম। তার ঠিক পরদিনই রা.বি পড়ুয়া আমার আরো অনেক কাছের মানুষদের মধ্যেও সেই একই উৎপীড়ণ দেখতে পেলাম। যেন বল পেলাম। এবার জানলাম বিষয় কী আর খুব ব্যাথিত হলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলার মাঠে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কোনো এক ছাত্রকে পিটিয়েছে সেনাসদস্যরা। ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করলে রাতে পুলিশ দিয়ে হলে হলে ঢুকে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামে সেনাক্যাম্প স্থাপন, ছাত্রদের উপর নির্যাতন— এসব কি কোনো তুচ্ছ ঘটনা? জ্ঞানচর্চার তীর্থে সেনাক্যাম্প কেন? সেনাবাহিনী কি উদ্বাস্তু, যে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা জায়গা করে দেবে? আবার বিশ্ববদ্যালয়ে তারা ছাত্র পেটালে, তাদের অঙ্গুলিহেলনে পুলিশ ছাত্রদের উপর নির্যাতন করলে ছাত্ররা প্রতিবাদও করবে না?— এমনটা হয় কখনো? প্রতিবাদ হয়েছে, প্রতিবাদ ছড়িয়েও পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাক্যাম্প স্থাপন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণেই সামিল। নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ন্যায্য। এই ন্যায্যতার পক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র-শিক্ষকরা প্রতিবাদ জানালো। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ চলবে না/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপর হামলা রুখে দাঁড়াও— এই শ্লোগান ব্যানারে লিখে তারা মৌন মিছিল করল। তাদের বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের ভাষা দেখে বুঝলাম তারা ঠিক কাজটাই করেছে। আমি কিছু সচেতন ছাত্র-ছাত্রী ও চিন্তক ব্যক্তিকে চিনি- জানি যারা যে কোনো প্রহসনের বিরুদ্ধে কথা বলে। তারাই ছিল এই মিছিলের সংগঠক। তাদের চিন্তা ও তৎপরতা আমাকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। আমি কামনা করতে থাকি তারা জয়ী হোক। সরকার, রাষ্ট্র এসব জটিল বিষয় সত্যিই আমি বুঝি না। কিন্তু মনে মনে এদের আচার আচরণ বিবেচনা দেখে বিস্মিত হই এবং নিজকে প্রশ্ন করতে থাকি— ওরা কেন এমন করে, কেন এমন হয়?

২ ॥ চারিদিকে ছাত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। সরকার ভীত। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বেড়েছে সাধারণ মানুষও চরম ক্ষ্যাপা। বিক্ষোভে তারাও যোগ দিয়েছে। এমন দৃশ্যগুলোই দেখছিলাম টেলিভিশনের পর্দায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্ররা বিক্ষোভ করছে। পুলিশের লাঠি-গুলি-টিয়ারগ্যাসের জবাবে তারাও তীব্র প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। দলিতের প্রতিবাদের ভাষা সহিংস হয়ে উঠেছে। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন ধরে যাদের উপর পুলিশ-প্রশাসনের দলন-নিপীড়ণ-নির্যাতন চলছে তারা প্রতিরোধ গড়তে গিয়ে সহিংস হবে না— এমনটা ভাবা যায় না। আমার কাছের মানুষেরা, যাদের আমি সচেতন চিন্তক বলে মনে করি, তারাও তখন ক্যাম্পাসে। আমি উদ্বিগ্ন, ভীষণ উদ্বিগ্ন। কী অবস্থায় আছে ওরা? বাধন, পার্থ, মামুন, টিটো, বাবু, প্রীতু কী অবস্থায় আছে, কোনো বিপদ হয় নি তো— এমন চিন্তাগুলো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। পুলিশ-প্রশাসনের নিপীড়ণ-নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে তো ওরা?

এর মধ্যেই দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টে গেল। সেইদিন বিকেল নাগাদ বিভাগীয় শহরগুলোতে কারফিউ জারি হলো। অন্যান্য শহরগুলোর মতো রাজশাহীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হয়েছে। অবিলম্বে ছাত্রদের হল-মেস ভ্যাকান্ট করতে বলা হয়েছে। ছাত্ররা কে কোথায় যাবে, কী করবে— তা অনিশ্চিত। এরই মধ্যে শুনতে পেলাম, রাস্তাঘাটে-রেলস্টেশন-বাসস্ট্যান্ডে সেনাবাহিনী-পুলিশ-বিডিআর ছাত্রদের দেখলেই নির্যাতন করছে। চারদিকে বন্দুক উঁচিয়ে সেনাবাহিনীর গাড়ি টহল দিচ্ছে। রাস্তাঘাট সব মানুষজন শূণ্য। চারিদিকে শুধু ভয় আর আতঙ্ক। মনে হচ্ছিল যেন মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে আবার ফিরে গেছি। কিন্তু দেশ তো আজ স্বাধীন। স্বাধীন দেশে সরকার-সেনাবাহিনীর এ কি আচরণ? পাকিস্তানী সরকার-সেনাবাহিনী থেকে তা আলাদা কোথায়?

৩ ॥ কারফিউ বহাল আছে। সারাদেশের মানুষের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলোর আচরণ বিটিভির মতো হয়ে গেছে। সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোনো সংবাদ-আলোচনা নেই। টক শোগুলো বন্ধ। দৈনিক পত্রিকার আয়তনও কমে গেছে। পরিস্থিতি আমাদের প্রতিনিয়ত জানান দিচ্ছে সরকার শুধু ভীতই নয়, তার আচরণ ক্রমেই পাগলা কুকুরের মতো বিচার বিবেচনাশূণ্য হয়ে পড়েছে।

এরই মধ্যে একটা লোমহর্ষক খবর পেলাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক'জন শিক্ষককে যৌথবাহিনী গ্রেফতার করেছে। কোন স্থানে তারা আছে কেউ জানে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের গ্রেফতার শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয়, সামগ্রিক শিক্ষক সমাজকে, শিক্ষকের উচ্চ নৈতিকতাকে অপমান করার সামিল। একজন স্কুল শিক্ষক হয়ে আমি এটাই উপলব্ধি করেছি। এরই মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মৌন মিছিল করেছিল তাদের উপর ঝুলছে গ্রেফতারের পরোয়ানা। তাদের অনেককেই আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আমি বিভিন্ন সুবাদে নিউটন, মামুন, মলয় এঁদেরকে চিনতাম, জানতাম। তারা কেউ কেউ আমাকে চেনে না। কিন্তু তাদের কথা, কর্মকাণ্ড আমি দেখি, শুনি, জানি আর স্বস্তি পাই। তাদের যে কোনো মুক্তচিন্তার সাথে আমি শরিক হয়ে যাই, সে আমি যেখানেই থাকি। এই মানুষগুলোকে জেলখানায় পোরা হলো। চারদিকের মানুষেরা তখন অস্থির। তাদের সহজনরা, ছাত্ররা কেউ ভালো নেই। মৌন মিছিলে অংশ নিয়েছিল বলে তাদের চিন্তার উত্তরাধিকার যাদেরকে তারা পরম ভালোবাসা আর যত্ন দিয়ে গড়ে তুলেছেন তাদের মাথার উপরেও অলিখিত পরোয়ানা ঝুলছে। সরকারের নানান সংস্থা ছবি-ফুটেজ দেখে ওদের খোঁজাখোঁজি করছে। পার্থ'র কথা আগেই বলেছি। সৎ চিন্তক লড়িয়ে মানুষদের মধ্যে ও-ই আমার সবচেয়ে কাছে বাস করে। ওরা বন্ধুরা সবাই শঙ্কিত, নিজ বাসস্থানে থাকার নিশ্চয়তাটুকুও নেই। না জানি কখন আর্মিতে হানা দেয় আর ধরে ফেলে। না, ওদেরকে আমার ভীতু মনে হয়নি। বা ধরা পড়ার ভয়ের জায়গাটা ছিল— এমন না। বরং ওদের চিন্তাভাবনা-কর্মকাণ্ডগুলো মুক্ত থেকে যেভাবে বিচ্ছুরিত করা সম্ভব, বন্দী হলে তা ব্যহত হবে। প্রতিবাদের জন্য বন্ধুদের আহ্বান জানানোর কাজ রুদ্ধ হয়ে পড়বে।

৪ ॥ আমি অবাক হয়ে প্রতি পদক্ষেপে বাইরের বিচরণ ক্ষেত্রগুলোতে লক্ষ্য করলাম আর আহত হলাম 'শিক্ষিত' সব মানুষদের অবিচল অবস্থান দেখে। আমি আমার চাকুরি সুবাদে আমার সাথে সংযুক্ত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, আমারই বন্ধু, প্রতিবেশী, আত্মীয় পরিজন সবার নিষ্ক্রিয়তাই শুধু উপভোগ করলাম। খুব জরুরী একটা কাজ, বৃত্তি পরীক্ষার শিক্ষার্থীদের নাম নথিকরণের গুরু দায়িত্ব ছিল আমার উপর। কিন্তু সেই সময় যাদের সহায়তায় সরেজমিনে এ কাজ আমি সম্পূর্ণ করব সেই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রবন্ধুদের ছত্রভঙ্গ অবস্থা। স্বাভাবিকভাবেই এ কাজের গুরুত্ব আমার কাছে কমে গেল। আমার মাথার উপরে সরকারী নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগে পরোয়ানা ঝুলছে। কিন্তু আমি সেটা ব্যাখ্যা করে অফিসে জানিয়ে কিছু বর্ধিত সময় দাবি করাতে তারা আকাশ থেকে পড়ল আর আমাকে দায়িত্ব-কর্তৃব্যহীন ভাবতে থাকলো। এক পর্যায়ে নির্লজ্জ প্রশ্নটি করেই বসল, কেন? আমার বসবাস কী ক্যাম্পাসের কাছে? মানে তারা কোনো সংযোগই খুঁজে পেল না, কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে আমি ব্যতিব্যস্ত। অদ্ভুত! এই লোকগুলোই আবার নাকি সামাজিক, কিন্তু সমাজের কোনো প্রাসঙ্গিক সমস্যাই তাদের

আবার স্পর্শ করে না! নিজেদের কোনো সন্তান যদি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া হতো তবে তারা এটাকে একটা বিরক্তিকর সমস্যা বলে নাক সিঁটকাত, ভাবত: 'খামোখা', এই গ্যাঞ্জামে সেশন জট হলো, এক্সাম ঠিক সময়ে হলো না। হ্যাঁ, হতে পারে অধিকার খর্ব হলে তা আদায়ের ভাষা সবার জানা থাকে না। স্বাধীনতার নেশায় সবাই উজ্জীবিত হয় না। কিন্তু কেউ যখন সেই গুরুদায়িত্বটা পালন করেই দিল, জ্বলে ওঠার স্থানটি হাতে করে দেখিয়ে দিল, সেই আঁচটি বুকে অনুভব না করে তাকে এক অযাচিত উপাখ্যান বলে ওরা কেমন করে অভিহিত করে! আমি বুঝি নি, বুঝি না। আমি শুধু কষ্ট পাই। এরাতো শুন্য পাত্র নয়, এদের দৈন্য ঘোঁচাবার জন্য কোনো রসদও আমি দিতে পারি না। নানান জঞ্জালে পূর্ণ তারা, আধার নাই। আশাহত হই শুধু। পরক্ষণেই খুঁজতে থাকি, কোনো আলৌকিক উপায়ে তারা শুধু একটু ভাবুক। একটু নিজের করে, আমি একজন তথাকথিত 'অসামাজিক জীব' হয়েও এই বিপুল 'সামাজিক জীব' সম্প্রদায়টাকে একটু ভাবাতে চাই। কেউ কেউ হয়তো স্কুল শিক্ষকের মুরোদ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু পরিসর যাই হোক, সবাই যদি আমরা স্বমূল্যায়িত হতাম, কারো দোহাই না দিয়ে নিজের মতো করে কথা বলতাম, অন্যায্যতাকে সমস্বরে না বলতাম, কেউ আমাদের অধিকার কুক্ষিগত করে রাখতে পারত না। আর ছিটে ফোটা পেয়ে আমাদের কেউ ধন্যও হতো না। নিজের শক্তিটাকে চিনতে হবে। নিজের শক্তিটা জানা চাই।

৫ ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বন্দী, শিক্ষার্থীদের নামে মামলা। স্বজনদের নামে ঝুলছে অলিখিত গ্রেফতারী পরোয়ানা। পরিস্থিতি আমার জন্য দমবন্ধের। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্ররা বিবেকের টানে মৌন মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। ভাঙচুর-সহিংসতা প্রভৃতিতে উস্কানির অভিযোগ প্রমাণের চেষ্টা চলছে আদালতে। কোন আদালত? কার আদালত? কোন আইনে বিচার হচ্ছে শিক্ষকদের? এই আইন কি বিবেকের বিরুদ্ধে নয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা-শিক্ষার সুন্দর পরিবেশের জন্যই তো তারা বিবেকের তাড়নায় লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন। তাহলে তাদেরকে বন্দী করা কেন? সবচেয়ে স্থুল মগজের ব্যক্তিরও বোঝার কথা, এত বড় দেশ, এত মানুষ, গুটিকয় লোককে কয়েদ করা কেন? এরাতো নিজেদের চিন্তার শক্তিকে হাতিয়ার করে নেমেছিল। কিন্তু তাদের আটকে ফেলার অর্থ দুইরকম হতে পারে। হয় সরকার বিকলাঙ্গ বা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, তাই এদের কথা যা আমার মতো গাধা মানুষও বোঝে, বোঝেই নি। বা দুই, সরকার বুঝল তাদের 'ষড়যন্ত্র' বিষয়ক মিথ্যার আস্ফালন ধরা পড়ে গেছে, তাই এদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে দমিয়ে দেবার চেষ্টা। বিবেকী প্রতিবাদীরা দমেছে কখনো? অত্যাচারীদের এই দমন-পীড়ণ থেকে নিস্কৃতি পেতে এরা আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চায়তে পারত। কিন্তু তারা মাথা নোয়ায় নি। এখানেই তো সব পরিস্কার হয়ে গেল, এরা ঠিক ঠিক এবং ঠিক। অথচ এই নিয়ে চলল প্রহসন। দীর্ঘদিন।

আমার আবার মনে পড়ল ৭১। ১৯৭১ এর ১৪ ডিসেম্বর যে উদ্দেশ্যে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল, সেই একই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে না তো? ৭১'এ সাদা চিন্তার মানুষ যারা জাতির মস্তিস্কের খাবার জোগায়, তাদেরকে দল বেঁধে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল যেন মানুষের শুধু হাত-পা এসব অঙ্গ থাকে, বুদ্ধি বিকাশের কোনো কারবারই না থাকে। ঠিক সেরকম কিছু করতে চাওয়া হচ্ছে বলে মনে হতে লাগলো। এই শিক্ষকরা যারা জেলবন্দী আছেন, তাদেরকে ওরা মেরে ফেলবে না তো? এমন দুশ্চিন্তায় যেন আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। মানসিক সমর্থন ছাড়া আমি তাদের কোনো সাহায্য করতে পারি নি যা তাদেরকে এই সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারে। নিজের গণ্ডীর মধ্যেই তীব্র অশান্তিতে কাটিয়েছি পুরোটা সময়।

৬ ॥ সকালের দৈনিক পত্রিকা বাড়িতে আসলেই আমি খুঁজি শিক্ষকদের মুক্তির খবর। শিক্ষকদের কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তারা কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। উকিলরা সওয়াল জবাব করছেন— এমন খবরাখবরের মধ্যে কখনো কখনো শিক্ষকদের প্রিজন ভ্যানে তোলার ছবি পত্রিকায় দেখতে পেতাম। শিক্ষকদের বিবেক ও নৈতিকতাকে বন্দী করার চেষ্টা আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। কতদিন যে অকারণ কান্নায় আমি অস্থির হয়েছি তা বলতে পারব না। শিক্ষকদের মুক্তির জন্য সহজনদের লড়াইয়েরও কমতি ছিল না। সহজনরা শিক্ষকদের জেলবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য প্রচণ্ড আর্তি নিয়ে ছুটেছে। এই ছুটোছুটিতে আমি শারিরীকভাবে থাকতে না পারলেও সারাক্ষণ তাদের সাথে ছিল আমার 'আমি'। উদিসা, যিনি একজন মানুষ খুব ছুটেছেন সেসময়। আমি তার সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানি না। কিন্তু সে জানে না কত বড় ভক্ত হয়ে গেছি তার। শুধু তার এই আন্তরিক তৎপরতার জন্য। স্বপ্নাদি, বাধন, পার্থ, টিটো, ধী— সবচেয়ে কাছ থেকে আমি এদের দেখেছি। দেখেছি ওদের চোখের সেই 'দিশেহারা' আর 'আশাবাদী' প্রত্যয়। শিক্ষকদের মুক্তির জন্য এরা পত্রিকায় লেখালেখি করছে, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করছে, পত্রিকা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলছে, মানুষকে ভাবাচ্ছে। আমি এদের সবার কাছে ঋণী। কারণ এরা আমার ভাবনাতেও আঁচড় কেটেছে। কিন্তু সরকারি গোঁয়ার্তুমি তাদের ভাষা বুঝতে অপারগ। তাই কখনো কখনো ওরা মনে মনে মুক্তি কামনা করেছে।

৭ ॥ মানুষের লড়াই তার স্বাধীন চেতনারই প্রতিফলন। স্বাধীনতার পথ ধরেই মুক্তি আসে। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করেছিলেন, শিক্ষার সুন্দর পরিবেশের কথা বলেছিলেন, তারা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, শুধু শিক্ষা নয়, সমগ্র সমাজের মুক্তির কথাও উচ্চারণ করেছেন। তাদের পেছনের ইতিহাস তাই বলে। স্বাধীনতাকামী এসব মানুষগুলোকে আমি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অনুভব করি আমার নিজের আত্মানুভূতি দিয়ে। বিশেষ করে একজনের কথা আমি, না বললে নিজের সাথে সত্যি প্রতারণা করা হবে। নিউটন। আমার সাথে তার সম্পর্কের কোনো সাজানো নাম নাই। আমি 'নিউটন' সত্তার একনিষ্ঠ প্রেমিক। তার স্বাধীনতা বোধ প্রতিদিন আমার বোধকে আরো তীব্রভাবে প্রতিবাদী হতে, সঠিক পথের সন্ধান করতে সাহস দেয়। আমি সত্যি আমার মানবিক সত্তাটাকে নতুন আলোতে আবার ঝালাই বাঁধাই করতে পেরেছি তার সাথে পরিচিত হতে পেরে। তার শরীরী অবস্থান আজ গৌণ হয়ে গেছে, এতো বড় তার আত্মিক অবস্থান। এত তীব্র আবেগ আমার তার জন্য, আমি কোনোদিন জেলে তার সাথে দেখা করতে যাইনি। একদিন গিয়েও পালিয়ে এসেছি। না, তাঁকে কিংবা তাঁদের গরাদের ওপারে দেখার শক্তি, সাহস আমার নাই। যেদিন ওদেরকে প্রহসনের আদালতে সাজা দেয়া হলো, আমি ও আমার খুব কাছের বন্ধু ধীরাজ— আমরা আদালত থেকে রিক্সা করে ফিরছিলাম। অবাধ কান্নায় আমি ভিজে চলেছি সেদিন। ধীরাজও খুব গুণ্ডা, আমারই মতো ওরও হয়তো ইচ্ছা হচ্ছিল সবাইকে, যারা এই রায় দিল, খুন করে ফেলি। সব তছনছ করে ফেলি। আমারই কলিগ স্বপ্নাদি— মলয় স্যারের ওয়াইফ, আমারই কলিগ ফিরোজা আপা— মামুন স্যারের মা, উদিসার মা— এরা কেন বিচলিত সবাই বুঝছিল কিন্তু আমার এই অসহ্য আবেগ কারোরই বোধগম্য হয় নি। অনেকে আমাকে প্রশ্নই করেছে ইনারা কেও আমার আত্মীয় কি না। আমি কেন কাঁদছি! এদের জন্য আমার প্রশ্ন, প্লিজ, আপনারা একটু উত্তর দিন, আমাকে না, নিজেকে— আপনাদের অন্তর কেন কেঁদে উঠলো না? আপনারা কী করে বলতে পারলেন, 'যেমন কর্ম করবে, তেমন ফল পাবে'। কি নিষ্ঠুর! হ্যাঁ, ওদের চিন্তাকে কেউ বন্দী করতে পারবে না। ওরা যেখানেই থাকুক, কী জেলে কী পাতালে, ওরা মানুষের পক্ষে, স্বাধীনতার পক্ষে নিজস্ব ভাষায় লড়াই করবেই। কিন্তু যে লোকগুলোকে বাইরে রেখে গেল তাদের আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করতে, তারা তা পারুক বা না পারুক, তাদের একটা মৌন সম্মতি তো সেই আদর্শের প্রতি থাকতে পারে। আর সেটাই স্বাভাবিক ছিল। ওরা তো নিজের জন্য না বরং আমি স্পষ্ট দেখি আমার জন্য, আমার সন্তান, আমার পরিপ্রেক্ষিত, আমার মুক্তি সবকিছুর জন্য তারা লড়াই করেছে। কিন্তু এই মুক্তি তো শুধু তাদের সন্তানসন্ততি বা স্বজনদের মুক্তি না, এতো আমারই আত্মার মুক্তি। যে পিপাসা আমার মধ্যেও আছে কিন্তু আমি বলতে পারি না, কিন্তু তারা পারে। আজ আমি মুক্ত আর তারা কারাবন্দী— এ কি আমার আত্মপীড়ণ না?

৮ ॥ মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের কাছে তাদের ঋণ অনুভব করেছে। আর তাই সেই ঋণের দায় শিক্ষকদের মুক্তির পক্ষে সমর্থন যুগিয়েছে। এই সমর্থন গণদাবিতে রূপান্তর হলেই সরকার নতজানু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মুক্তি দেয়। যেদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মুক্তি পেলেন, এদের একেক জনের অপার্থিব আলোতে আলোকিত মুখ আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বন্দীদশায় ছাত্র-ছাত্রীরা জেল গেটে তাদের শ্রদ্ধার স্মরণে ফুল দিয়েছিল, মনের ফুলমালা দিয়ে আমি এদের আপন করে নিয়েছিলাম সেই ক্ষণে। আজ তাদের কারামুক্তির দিনে ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দিত। শ্রদ্ধার ফুল নিয়ে তারা গেছে জেলগেটে, শিক্ষকদের অভিনন্দন জানাতে। শিক্ষকের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের এই অনুভব শিক্ষকের উচ্চ নৈতিকতা ও মর্যাদারই স্বীকৃতি। আমি গর্ব বোধ করতে থাকি। কেননা আমি নিজেও একজন শিক্ষক। আমি এদের কেউ না কিন্তু এরা সবাই আমার আত্মার প্রতিরুপ। এক চিন্তা, এক বোধ, এক প্রেম।

শিক্ষকদের মুক্তি হলেও ছাত্রদের নামে তখন আদালতের সমন ঝুলছিল। ছাত্ররা এরই মধ্যে 'আত্মসমর্পন' করে। এরাও জেলখানায় বন্দী হয়ে যায়। কিন্তু সহপাঠীদের সমানুভূতি, প্রেম-ভালোবাসা— এদের মুক্তির জন্য সংগ্রামে রূপ নেয়। সরকারের অন্যায্য, অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে— কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। কর্তৃত্ব-বিরোধী এই আন্দোলনের কর্মীরা, আমার সহজন। এরা সবাই তখন আমার কাছে বাধন, পার্থ, প্রিতু, মামুন, বাবু, টিটো। আমি ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি না। আমিও সামিল হই ওদের আন্দোলনে। কর্তৃত্ব-বিরোধী প্রতিবাদী সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শরিক হই। সেদিন শহীদ মিনারে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন আমাকে 'মুক্ত-আমি'র স্বপ্ন দেখায়। মামুনের ক্যামেরায় তোলা ওদের মিছিলের ছবি, মানববন্ধনের ছবি দেখে আমি উজ্জীবিত হই। শারিরীকভাবে উপস্থিত থাকতে না পারার কারণে ভুগতে থাকি।

আমি কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িনি। পড়িনা এখনো। আমি ছাত্র নই, আমি খুবই সাধারণ একজন শিক্ষক। সরকারের সাথে অর্থনৈতিক দাসত্বের সূত্রে বাঁধা। জাগতিক প্রয়োজনে এই দাসত্ব বা বাধ্যবাধকতা আমাকে ঘামায়, ক্লান্ত করে, আমার পক্ষাঘাত হয়, অঙ্গহানী ঘটায়। কিন্তু আমার মগজটাকে ছুঁতে পারে না। ওটাই আমার একমাত্র সম্বল। আমার কাছে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র টাকা বা কোনো মুভমেন্ট

বাবদ চাঁদা চায়, আমি খুবই লজ্জিত হই। আমার ক্ষমতা এতো সীমিত, সর্বাধিক যা পারি দিয়েও লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে যাই। অথচ আমি জানি ঐ টাকাটা আমার হয়তো একদিনের খাবার খরচ, (সত্যি তাই, কাব্য নয় এটা) অথচ তবুও আমি কুঁকড়ে যাই ওদের সদিচ্ছার কাছে। কী দীপ্ত প্রত্যয় এদের। কোথায় ভালো রেজাল্টের জন্য নোট কপি করে বেড়াবে তা নয়, খেয়ে না খেয়ে প্রতিরোধ গড়ছে। এদের কারো একটা দামী জামা নাই, দামী সৌখিন কিছু নাই, বয়স হিসেবে আমার তুলনায় নিতান্তই কিশোর কিন্তু কী সততা আর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আমার বোধবুদ্ধির অনেক উর্দ্ধের চিন্তাগুলো করতে পারে। আর তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। মুক্তবুদ্ধির চর্চায় অনুরাগী করতে প্রতিটি মানব সত্তাকে পথ দেখানোর যে বিশাল কাজখানি এরা করে, সে-ত এক সার্বজনিন প্রয়াস বলেই আমি মনে করি। আমি এদের শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, সাথে থাকতে চাই, থাকতে পারলে শুদ্ধাত্মা হয়ে উঠার পথ প্রসারিত হয় বলে মনে করি।

৯ ॥ আন্দোলনের চাপে সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও মুক্তি দেয়। বিবেক যেখানে জাগ্রত, ঐক্য যেখানে সংহত, সেখানে কোনো কর্তৃত্ব টিকে থাকতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তচিন্তার শিক্ষক-ছাত্ররা তার প্রমাণ দিল। তাদের এই প্রদর্শিত পথ আমার কাছে পাথেয়। আমরা আমাদের যার যে সত্তা তা দিয়ে তাদের এই কর্তৃত্ব-বিরোধী তৎপতরার সাথে একাত্ম হই, বিশাল এক বন্ধুমহল গড়ে তুলি, আমি বিশ্বাস করি, সামাজিক-মানসিক-মানবিক, অনেক সমস্যা সমাধানের পথ আমরা পাব। আমাদের অবশ্যই মগজটাকে স্বাধীন রাখতে হবে। আমরা স্বাধীন হলে, বুকে প্রেম থাকলে, ভালোবাসা থাকলেই কেবল মানুষ হয়ে উঠি। আমি এই মানুষ সত্তাটাকেই উপলব্ধি করেছি। আমার উপলব্ধিতে প্রেম ধনী-গরীব, জাতি-বর্ণ, নারী-পুরুষ কোনো ভেদ মানতে রাজি না। এই প্রেমই আমাদের এক চিন্তা, এক বোধের জন্য লড়াইয়ের প্রেরণা দেয়।

লেখক পরিচিতি: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

আন্দোলনের কর্তৃত্ব-বিরোধী ধারা: ইশতেহারের মূল প্রস্তাবনা

আরিফ রেজা মাহ্‌মুদ টিটো

মানবপ্রকৃতি: অস্তিত্বের শেকড় ও অখণ্ডতার সূত্র

স্বাধীনতা হচ্ছে মানুষের আত্মশক্তির বীজ। স্বাধীনতাই মানবীয় সৃজনশীলতার ধাত্রী। সংহতি এই স্বাধীনতার অস্তিত্বের শর্ত— স্বাধীনতার ধারক। স্বাধীনতা-সংহতি-সৃজনশীলতা হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রবণতা। মানবপ্রকৃতির জ্ঞানধারা নির্মিত হয়েছে মূলত এই উপলব্ধিকে আধার করে।

> একজন মানুষ যখন তার স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেয়, তখন সে তার অনিবার্য মনুষ্যত্বকেই বিসর্জন দেয়। সে বিসর্জন দেয় তার সকল অধিকারকে। সে বিসর্জন দেয় নিজের মানুষ হওয়ার দায়িত্বকে। একটা মনুষ্যত্বহীন প্রাণীতেই তখন সে পর্যবসিত হয়। এমন সর্বস্বত্ব ত্যাগের আর কোনো খেসারত হতে পারে না। অপর কিছুতেই এর কোনো পূরণ ঘটে না। মানুষের মনুষ্যপ্রকৃতির সঙ্গে এ সঙ্গতিহীন। আর একজন মানুষকে যখন তুমি তার ইচ্ছা বিবর্জিত প্রাণীতে পর্যবসিত কর, তখন তুমি তার ক্রিয়াকর্মকেই নৈতিকতাশূন্য কর্মে পর্যবসিত কর। (রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট: সরদার ফজলুল করিম অনুদিত; পৃ:২৯)

স্বাধীনতার বিধি হচ্ছে: আত্ম অস্তিত্ব সংরক্ষণ। এর প্রধান বিবেচ্য নিজের স্বার্থকে রক্ষা করা। যে মুহূর্তে ব্যক্তি যুক্তির বয়স অর্জন করে, সে মুহূর্তে সে নিজের প্রভুতে পরিণত হয়। কারণ তার অস্তিত্বের সর্বোত্তম নিশ্চয়তা কিসে, এখন সে নিজেই তার নির্ধারক। (রুশো) নিজ অস্তিত্ব সংরক্ষণে নিজেই নিজের নির্ধারক হওয়ার অধিকারই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার নয়। নিজকে দিয়ে অন্যের বিষয়ে যা ইচ্ছে তাই করানোর অধিকার নয়। বরং স্বাধীনতা হচ্ছে নিজ বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নেবার তথা নিজ দায়িত্ব নিজ কাঁধে নেবার অধিকার। সুতরাং স্বাধীনতা যেন স্বেচ্ছাচার না হয় তার জন্য পরস্পরের স্বাধীনতার প্রতি পরস্পরের সম্মতি প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতার নিশ্চয়তাই হচ্ছে সামগ্রিক সমাজের স্বাধীনতার পূর্বশর্ত। প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা তখনই নিশ্চিত হয় যখন মানুষ অন্যের স্বাধীনতা হরণ করে না। সংহতি মানুষের এই স্বাধীনতাকে রক্ষণ করে। সংহতি হচ্ছে মানুষের সেই প্রবৃত্তি যা মানুষকে শুধু যুথবদ্ধই করে না বরং পরস্পরের স্বাধীনতার প্রতি পরস্পরের সম্মতি ও দায়কে ধারণ করে। সংহতি হচ্ছে স্বাধীনতার ঐক্যতান।

সৃজনীশক্তি মানুষকে জীবজগতে অনন্য করে তোলে। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর এই বিশেষত্ব নেই। ভাষাতত্ত্বে বিপ্লব সৃষ্টিকারী জেনারেটিভ গ্রামারের উদ্ভাবক নোম চমস্কি তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় যে লক্ষ্যণীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা হলো মানুষ সহজাত ভাবসম্পন্ন। চমস্কি যুক্তি দেখান যে, ভাষার ব্যকরণ কাঠামোর অন্তর্নিবিষ্ট রূপগত বিধান বুঝতে পারার ক্ষমতা মানুষের সহজাত। প্রজাতিগতভাবেই মানুষ এই বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। খুব অল্প বয়সেই শিশুরা বড়দের কথাবার্তা শুনে ব্যকরণের জটিল বিধানগুলো আয়ত্ত করে ফেলে। একজন শিশু পরবর্তীতে এই বিধানগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে খুব নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ দিয়েই অসংখ্য বাক্য সে প্রণয়ন করতে থাকে। এই বাক্যগুলো অশ্রুত অর্থাৎ নতুন। তাই ব্যকরণের অন্তর্নিহিত বিধান চিনতে পারার সক্ষমতা এবং অসংখ্য বাক্য উৎপাদনের এই সহজাত ক্ষমতাকে সৃজনশীলতা বলে আখ্যায়িত করা যায়। (আ-আল মামুন) চমস্কি এ প্রসঙ্গে বলেন,

> যে কেউ ভাষা অধ্যয়নে আগ্রহী হলে অনিবার্যভাবে একটা বাস্তব সঙ্কটের মুখোমুখি হন। তিনি একটা পূর্ণবিকশিত প্রাণীসত্তা, কিংবা বলা যায় পরিণত বক্তার মুখোমুখি হন, যে-বক্তা কোনো-না-কোনোভাবে বিস্ময়কর মাত্রার সক্ষমতা অর্জন করেছেন। এই সক্ষমতা তাকে, বিশেষত, যেটা বুঝাতে চান ঠিকঠাক সেইটা বলতে এবং অন্য মানুষজন কী বলছে সেইটা বুঝতে সক্ষম করে তোলে। তাছাড়াও, তিনি এগুলো এমন পারঙ্গমতায় সম্পাদন করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন যাকে আমার মতে অন্তত সৃজনশীল বলাই শ্রেয়...। বলা চলে, অন্য যে কারো সাথে স্বাভাবিক আলাপচারিতায় একজন ব্যক্তি যা কিছু বলেন তার বেশিরভাগটাই অভিনব; আপনি যা শোনেন তার বেশিরভাগটাই নতুন, আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতার কোনোকিছুর সাথে এগুলোর নিবিড় সাদৃশ্য থাকে না। এগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো অভিনব আচরণ নয়, এগুলো এমন ধরণের আচরণ যা যথাযথরূপে পরিস্থিতিমাফিক। কিছুদিক বিবেচনায় এধরণের আচরণ সংজ্ঞায়িত করা অত্যন্ত দুরূহ এবং সত্যিকারার্থে এসব আচরণের ভিতর এমন অনেক বৈশিষ্ট্য জাহের থাকে যাকে সৃজনশীলতা বলাই যায়। (মুখোমুখি নোম চমস্কি এবং মিশেল ফুকো/ মানবপ্রকৃতি: ন্যায়নিষ্ঠা বনাম ক্ষমতা: আ আল মামুন অনুদিত, পৃ-৪৪)

মানববিদ্যার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতেও মানুষের সহজাত সৃজনশীলতার প্রমাণ পাওয়া যাবে বলে চমস্কি অনুমান করেন।

সৃজনশীলতার পূর্বশর্ত হচ্ছে স্বাধীনতা। বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষ কোনো কর্ম করে যে প্রক্রিয়ায় সফল হয় তা তার অভিজ্ঞতা তথা জ্ঞান হিসেবে সঞ্চিত থাকে। আগে যেভাবে সফল হওয়া গিয়েছিল পরবর্তীতে ঠিক একই কায়দায় সফল হতে হবে— এমন রীতি, জ্ঞান উৎপাদনে শৃঙ্খল সূচনা করে। একই কর্মের পুনঃ পুনঃ আবর্তন জ্ঞানকে রুদ্ধ করে ফেলে। কেননা জ্ঞান উৎপাদনে শৃঙ্খল-সূচনা পরীক্ষণকে নিষিদ্ধ করে ফেলে। ফলে নতুনের সৃষ্টি হয় না। সৃজনশীলতাও রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই সৃজনশীলতার জন্য স্বাধীনতা অনিবার্য।

আবার সংহতির মধ্যেই সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। সংহতিপরায়ণ মানবগোষ্ঠীতে শৃঙ্খল বা পরস্পরিক হানাহানি থাকে না বলে মানুষ স্বাধীনচেতা ও স্বকীয় হতে পারে। সংহতির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার চর্চা মানুষকে শিষ্ঠতা ও শান্তি দেয়। ফলে এই প্রতিবেশের মধ্যে মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ অনুকূল হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের এই সংহতি চর্চা প্রাকৃতিকও বটে। প্রকৃতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তার নানান ধরনের উপাদানের মধ্যে সংহতি তথা পারস্পরিক সহযোগিতা। প্রকৃতির এই সংহতি তার বিবর্তনের একটা বিশিষ্ট কারণ। জৈব সম্পর্কের সংহতি চর্চার মধ্য দিয়েই প্রকৃতিতে উৎপাদন-পুনরুৎপাদন সংগঠিত হয়। এই উৎপাদন-পুনরুৎপাদন সৃজনশীলতাকেই প্রতীকায়িত করে। এই সৃজনশীলতার কারণেই প্রকৃতি তার জৈব সম্পর্কের বিন্যাসের বিবর্তন ঘটায় এবং মানুষসহ অন্যান্য জীব জীবনের উচ্চতর বিকাশের পথে ধাবিত হয়।

স্বাধীনতা-সংহতি-সৃজনশীলতা অখণ্ডতার সূত্রে বাঁধা, মনুষ্যপ্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত এই বৈশিষ্ট্যই স্বয়ম্ভর ও বিশুদ্ধ। মানুষের স্বাধীনতা-সংহতি-সৃজনশীলতার এই স্বয়ম্ভর ও বিশুদ্ধ বিকাশের মধ্যেই মনুষ্যত্বের নিয়ম তথা বিধি-বন্দোবস্ত নিহিত থাকে।

কিন্তু কর্তৃত্ব মানুষের সহজাত প্রবণতাকে রুদ্ধ করে। মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক বিশুদ্ধিকে বিকশিত হতে বাধা প্রদান করে। মানুষের স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করার মাধ্যমে মানুষকে দাস বানায়। মানুষের মধ্যে উঁচ-নিচ ভেদাভেদ তৈরি করে মানুষের সমতাকে নষ্ট করে। মানুষের সংহতিপরায়ণতাকে ভেঙ্গে ফেলে মানুষকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়।

কর্তৃত্ব: অস্তিত্বের বুকে ছুরি— মনুষ্যগহনে রক্তক্ষরণ

> কর্তৃত্ব কী? এটা কি প্রকৃতির নিয়মের কোনো অবিসম্ভাবী ক্ষমতা? যা নিজকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের প্রপঞ্চগুলোর প্রয়োজনীয় সংযোগ ও পরম্পরাগুলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে? এই নিয়মগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুধু নিষিদ্ধই নয়, অসম্ভবও বটে। আমরা এগুলোকে ভুল বুঝতে পারি, এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হতে পারি কিন্তু আমরা এগুলোকে অস্বীকার করতে পারি না। কারণ এগুলো আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি ও

মৌলিক শর্ত নির্মাণ করে। এগুলো আমাদেরকে আবৃত করে, পূর্ণ করে তোলে এবং আমাদের সকল চিন্তা ও কাজের গতিবিধি পরিচালনা করে। এমনকী আমরা যখন মনে করি আমরা এগুলোকে অস্বীকার করছি তখন আমরা এগুলোকে শুধু রোষই দেখাই।

হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই এই নিয়মগুলোর দাস। কিন্তু এ ধরনের দাসত্বের মধ্যে কোনো গ্লানি নেই। কিংবা এটা আদতে দাসত্বই নয়। দাসত্বের ক্ষেত্রে যেখানে ব্যক্তির বাইরের একজন প্রভু বা আইন বিধায়ক ব্যক্তিকে হুকুম দেয়, সেখানে এই নিয়মগুলো আমাদের বাইরে নয়। এগুলো আমাদের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং আমাদেরকে নির্মাণ করে। আমাদের সামগ্রিক নির্মিতি— শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক– এগুলো সবই এর মাধ্যমে সংগঠিত হয়। আমাদের বাঁচা, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, আমাদের কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা, আমাদের আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই এই নিয়ম অনুসারে সংগঠিত হয়। এগুলো ছাড়া আমরা কিছুই না— আমাদের কোনো অস্তিত্বই নেই। (বাকুনিন: কর্তৃত্ব কী? অনুবাদ: লেখক)

প্রকৃতির নিয়মগুলো আমাদের অস্তিত্ব— এগুলোকে কোনোভাবেই কর্তৃত্ব বলে চিহ্নিত করা যায় না। কর্তৃত্ব মানে কর্তাগিরি। কর্তৃত্ব হচ্ছে সহজ কথায় শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র কর্তার ইচ্ছায় কর্ম সাধিত হওয়া। অর্থাৎ যখন কর্তার খেয়াল খুশি মোতাবেক কাজ করা হয়— যাতে অন্য কারো কিছু বলার বা করার থাকে না তখন তাকে কর্তৃত্ব বলা হয়। সুতরাং কর্তা হওয়া এবং অন্যের বিষয়ে নাক গলানোর বা সিদ্ধান্ত নেওয়া কিংবা দেয়াই হচ্ছে কর্তৃত্ব। কিন্তু এই মাফিক কর্তা কে? আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী, 'যে করে' সে? 'কারক'? না...। আসলে কর্তা হচ্ছে: কোনো ব্যক্তির বাইরের শক্তি যা ঐ ব্যক্তির ইচ্ছার তোয়াক্কা না করেই ব্যক্তির উপর বল বা শক্তি প্রয়োগ করে। সুতরাং কর্তৃত্ব হচ্ছে একটা সম্পর্ক যেখানে কর্তা ও উদ্দিষ্ট থাকে এবং কর্তা উদ্দিষ্টের উপর বল বা শক্তি প্রয়োগ করে। কর্তৃত্ব বলতে আমি শক্তিমানের বলপ্রয়োগকেই বুঝি। আবার কর্তৃত্বের সাথে ক্ষমতার একটা সম্পর্ক আছে। কর্তৃত্ব যদি 'শর্ত' বা 'সূত্র' সাপেক্ষ হয় অর্থাৎ চুক্তির বাঁধনে বাধা পড়ে এবং চুক্তির উপর ছদ্ম-সম্মতি প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই আমরা তাকে ক্ষমতা বলতে পারি। সুতরাং ক্ষমতা নিজেও হচ্ছে এক ধরণের সম্পর্ক। ক্ষমতা সম্পর্ক হচ্ছে বল প্রয়োগের 'স্বীকৃত' 'শর্ত' বা 'সূত্র' যা ছদ্ম-সম্মতির দ্বারা বৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং সামাজিক সম্পর্কের যুথবদ্ধতার সূত্রকে ভেঙ্গে কর্তৃত্ব কায়েম করে। এই কর্তৃত্ব আরোপণ যখন একমুখী হয়ে পড়ে তখন তাকে বলা হয় অসম ক্ষমতা সম্পর্ক। এই অসম ক্ষমতা সম্পর্ক মূর্ত হয়ে ওঠে প্রধানত চারটি বিষয়ের মাধ্যমে। এই চারটি বিষয় হচ্ছে:

১. ভূমির অসম মালিকানা,
২. শ্রমের উদ্বৃত্ত শোষণ
৩. দেহগত ও লৈঙ্গিক আধিপত্য
৪. ভাষা-সংস্কৃতি-জ্ঞানগত আধিপত্য।

রাষ্ট্র এই অসম ক্ষমতা সম্পর্কের রক্ষক।

রাষ্ট্র: জল্লাদের দরবার— জুলুমের কসাইখানা

বলাবাহুল্য রাষ্ট্র নিজেই একটা ক্ষমতাকাঠামো— কর্তৃত্বের চরম সংস্থা। জনগণের প্রতিটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা চর্চার প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র। কাজেই রাষ্ট্র মানেই সকল বিষয়ে মাতবরি— সকল বিষয়ে কর্তাগিরি-হুকুমদারি।

'আধুনিক' রাষ্ট্র হচ্ছে এলিটদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ম্যানেজারিয়েল সিস্টেম। এলিটদের স্বার্থ রক্ষাকারী সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার কমিটি হচ্ছে এই রাষ্ট্র। রাষ্ট্র নামক এই কমিটির কাজ এলিটদের নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসা করা, ছোট লোকদের শোষণ করে বড় লোকদের ধন-সম্পত্তি পাহারা দেয়া, মৌলিক অর্থে 'প্রতিপক্ষ' শ্রেণী-গোষ্ঠী-দল-শক্তিকে ধ্বংস করা ইত্যাদি। এলিটদের— শাসকশোষকদের তৈরি করা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে 'সমন্বয়' সাধন করা এই কমিটির আর একটা কাজ। এইসব 'ফরজ' কর্মসম্পাদনের জন্য এই কমিটির হাতে থাকে আমলাতন্ত্র বা প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিচার বিভাগ বা আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহ, উর্দি বিভাগ বা পুলিশ-সেনা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ মিডিয়া বা মতাদর্শিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। (সেলিম রেজা নিউটন)

কর্তৃত্ব যে চারটি বিষয়ের মধ্য দিয়ে প্রধানত মূর্ত হয়ে ওঠে তার নিরাপত্তাদাতা হচ্ছে রাষ্ট্র। প্রকৃতির প্রতিকুলতার সামনে উৎপাদনের উপায়ের সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষের চাহিদার বিপরীতে সম্পদ সীমিত হয়ে পড়ে। ফলে এই সীমিত সম্পদের উপর প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। এই প্রতিযোগিতাই জৈব-সংহতির সূত্রকে ভেঙ্গে— যুথবদ্ধতাকে বিপন্ন করে বলপ্রয়োগকেই নীতি হিসেবে বেছে নিতে 'বাধ্য' করে। বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই কিছু লোক ভূমির মালিক হয়ে ওঠে এবং সেই ভূমির মালিকানাকে সংরক্ষণ করতে পাহারাদারির তথা বলপ্রয়োগের সংস্থা গড়ে তোলে। রাষ্ট্র সেই সংস্থারই বিকশিত রূপ। রাষ্ট্র ঐতিহাসিকভাবেই ভূমির অসম মালিকানাকে আইনগতভাবে রক্ষণ করে।

শ্রম হচ্ছে উৎপাদনের প্রধান উপায়। উৎপাদনের কাঁচামালে শ্রম প্রযুক্ত হলেই কেবল তা পণ্য হয়ে ওঠে। পণ্য উৎপাদনের জন্য শ্রমের যে মূল্য নির্ধারিত হয় এবং পণ্যের যে মূল্য নির্ধারিত হয় তার ব্যবধানই শ্রমের উদ্বৃত্ত শোষণ। শ্রমের উদ্বৃত্ত শোষণের মধ্য দিয়েই পুঁজি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর আকার ধারণ করে। অপরদিকে শ্রমের যোগানদাতা শ্রমিক শুধুমাত্র ততটুকুই পায় যতোটুকু পরবর্তীতে শ্রম প্রদানের জন্য তার জৈবিক শক্তির যোগান হিসেবে প্রয়োজন। শ্রমের উদ্বৃত্ত শোষণের মধ্য দিয়েই, যে পুজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে রাষ্ট্র তার আইনগত ম্যানেজারিয়াল কমিটি হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকে।

মানুষের জৈব-বিবর্তনের সূত্রে সংহতি থেকে ছেদ এবং জৈব-বলপ্রয়োগের সূচনার মধ্য দিয়েই দেহ ও লৈঙ্গিক আধিপত্যের সৃষ্টি। জৈব-বলপ্রয়োগে শক্তিমান সত্তা হিসেবে পুরুষের উত্থান নারীকে করে অবদমিত। সম্পদ-উত্তরাধিকার নির্ধারণের জন্য পুরুষের বীজ-বিশুদ্ধতার নিশ্চিতির উপর ভিত্তি করেই সমাজে ক্রমাগতভাবে পুরুষের লৈঙ্গিক আধিপত্য কায়েম হতে থাকে। সম্পদ-উত্তরাধিকার-বীজ বিশুদ্ধির রক্ষাকর্তা-বিধানদাতা হিসেবে রাষ্ট্র ঐতিহাসিকভাবেই সর্বদা হাজির থেকেছে। বর্তমানে ভুঁইফোঁড় আইনের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সমতার প্রশ্নটিকে রাষ্ট্র মীমাংসা করতে চাইলেও নারী পুরুষের মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যেকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সেই সবচেয়ে বড় ক্ষত্রশক্তি।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে টিকে থাকে না। এই ক্ষমতা টিকে থাকার জন্য জনগণের সম্মতি উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। এই সম্মতি উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্র ও অপরাপর ক্ষমতাশক্তি মতাদর্শিক প্রচার-প্রচারণার সিস্টেম তৈরি করে। এর মাধ্যমে ক্ষমতার আকাম-কুকামকে বৈধ করে তোলা হয়। মিডিয়া হচ্ছে প্রচার-প্রচারণা সিস্টেমের প্রধান ক্ষত্রশক্তি। একটি যুগের ভাষিক অর্থ চর্চা এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি নির্মাণ করে মিডিয়া। ক্ষমতা-তাড়িত মিডিয়ার এই ভাষিক অর্থ চর্চা এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি নির্মিত হয় ক্ষমতারই অনুগামী হয়ে। ক্ষমতা-সম্পর্কের শক্তিধর প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র এর প্রধান সুবিধাভোগী এবং এই কারণে রক্ষকও বটে।

সামাজিক চুক্তি-রাষ্ট্র-রাজনৈতিক দল: 'জনশক্তি'র মিথ ও আত্মাহীন ক্ষমতার রক্ত-পিপাসা

আমাদের এমন একটা সংস্থা তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব ও সম্পদকে রক্ষার জন্য সমগ্র সংস্থার শক্তিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে পারি যাতে আমরা যখন সমগ্রর সাথে মিলিত হই তখন আমার নিজেদের সম্মতিতে নিজেদের ইচ্ছারই মাত্র অনুগত হই এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা এবং শক্তি পূর্বের মতোই অক্ষত থাকে। ... সম্মতির ভিত্তিতে সমাজ সংস্থা যখনই বাস্তব রূপ লাভ করে তখনই এই সংস্থা প্রত্যেকটি সদস্যের জন্য সমগ্র সংস্থার নৈতিক এবং যৌথ শক্তি সহকারে প্রতিটি সদস্যের পাশে এসে বিত্রস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে উপস্থিত হয়। এবং এরই পরিণামে সমাজসংস্থার নবতর অস্তিত্ব এবং ইচ্ছার শক্তিপ্রাপ্ত হয়। নাগরিকদের সমবায়ে গঠিত এমন সমাজ সংস্থাকে প্রাচীনকালে একটা নগর বা নগররাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করা হতো। পুরাতন সেই অভিধার স্থলে আজ আমরা তাকে একটা রিপাবলিক বা রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে অভিহিত করে থাকি। এবং এই সংস্থাকে মানুষ তার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় 'রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করে; ক্রিয়াশীল অবস্থায় এই সংস্থাই সার্বভৌম জনশক্তিতে পরিণত হয়। (রুশোর সোশ্যাল কনট্রাক্ট: সরদার ফজলুল করিম অনুদিত, পৃ:৩৬, ৩৭, ৩৮)

রাষ্ট্রের সামাজিক চুক্তির ধারণায় রাষ্ট্রকে দেখা হয়েছে 'জনগণের সার্বভৌম শক্তি' হিসেবে। 'জনগণের সার্বভৌম শক্তি' হিসেবে রাষ্ট্র সমগ্রর উপর কর্তৃত্বের অধিকারী হয় জনগণের অধিকার সাপেক্ষে। জনগণের এই অধিকার মানে 'নিজেদের সম্মতিতে নিজেদের ইচ্ছারই মাত্র অনুগত' হওয়া। ফলে সামাজিক চুক্তির ধারণামাফিক রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের মাধ্যমে সম্মিলিত কর্তৃত্ব তথা নিজেদের ইচ্ছার আনুগত্য নিশ্চিত হয়। কিন্তু এটা অসম্ভব। কেননা রাষ্ট্রের ক্ষমতা সর্বদায় ন্যাস্ত থাকে সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতার বিন্যাস ক্রমকর্তৃত্বতান্ত্রিক। ফলে সমাজ সংস্থা হিসেবে 'ক্রিয়াশীল অবস্থাতেই' রাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত হয়— জনশক্তিতে নয়। তাই রাষ্ট্র জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু জনগণের উপর দণ্ডায়মান একটা ক্ষমতাকাঠামো হিসেবে টিকে থাকে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকাঠামোর ক্ষমতা বিন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমলাতন্ত্র। এই আমলাতন্ত্র যান্ত্রিক এবং যান্ত্রিক সুর-তাল-লয়-ছন্দে তা ক্রিয়াশীল থাকে, সেই সাথে সবকিছুকেই যান্ত্রিকতার নিগড়েই গড়ে তুলতে চায়। এরকম নিষ্প্রাণ একটি সংস্থা যেমন চরম মূলানুগ তেমনি চরমভাবে তা সৃষ্টিশীলতা বিরোধী। উনিশ শতকের সিন্ডিক্যালিস্ট আন্দোলনের বিশিষ্ঠ চিন্তক ও সংগঠক রুডলফ রকার বলেন,

মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্মতি আর সমর্থনের ভিত্তিতে সংহতিপূর্ণ সহযোগিতার পথে এ-যাবৎ কালের সবচেয়ে বড় বাধাটা সৃষ্টি করেছে আত্মাহীন রাজনৈতিক আমলাতন্ত্রের সদা বর্ধমান ক্ষমতা, এবং তা গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে নবতর বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনা। অথচ এই রাজনৈতিক আমলাতন্ত্রই দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মানুষের জীবন রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখভাল করে থাকে। যে-সিস্টেম তার জীবদ্দশার প্রত্যেকটা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জনগণের বৃহৎ অংশগুলোর— আজ্ঞে হ্যাঁ, পুরো জাতির— মঙ্গল ও কল্যাণ জবাই করে দেয় ক্ষুদ্র সংখ্যা-অল্পের ক্ষমতা আর অর্থনৈতির স্বার্থের কামনা-বাসনা পূরণ করার জন্য, সেই সিস্টেমটাকে তো সমস্ত সামাজিক বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে ফেলতেই হবে, আর লিপ্ত হতে হবে এমন এক সার্বক্ষণিক যুদ্ধে, যে যুদ্ধ সবার বিরুদ্ধে সবার। (রুডলফ রকার: নৈরাজ্যবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সেলিম রেজা নিউটন অনূদিত, অপ্রকাশিত)

কিন্তু আমলাতন্ত্রের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ রাষ্ট্রের 'গণমুখী' মুখোশকে উন্মোচন করে ফেলে। তাই রাষ্ট্রকে সর্বদাই জনগণের দোহাই পাড়তে হয়। জনগণের দোহাই পাড়ার একটা বিশেষ রূপ হচ্ছে রাষ্ট্রের 'জনপ্রতিনিধিত্ব'। নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থার দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকে গণতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করার চল খুবই প্রবল। কিন্তু

সামগ্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র তার উপর শোষণ-শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার কর্তাকেই বেছে নিতে পারে। শোষণ-শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ কখনোই নির্বাচনের মাধ্যমে সম্ভব হয় না।

রাষ্ট্রে 'জনপ্রতিনিধিত্ব' কায়েমের জন্য রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি। রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই জনগণ কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন করে এবং রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক বানায়। ফলে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনায় রাজনৈতিক দল হচ্ছে মুখ্য কর্তা এবং জনগণ গৌণ। তাই রাজনৈতিক দল হচ্ছে এই ক্ষমতার বিন্যাসে নির্বাচিত শোষক-শাসক। রাজনৈতিক দলের কাঠামোও নির্মিত হয় রাষ্ট্রের কাঠামোর ছাঁচে। কী 'গণতান্ত্রিক' কী 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র উভয় জায়গাতেই রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতা। এই রাষ্ট্রক্ষমতার ঝোঁক-প্রবণতা-মাত্রাগুলোর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বব্যাপিতা এবং নিরঙ্কুশ স্বৈরচরিত্রের কোনো পার্থক্য নেই।

মার্ক্সবাদ, রাষ্ট্র ও মুক্তি: ঠুলি-আঁটা চোখে দুনিয়াপাঠের বোধন-উদ্বোধন

রাষ্ট্রভিত্তিক সমাজতন্ত্র মার্ক্সীয় ধ্যানধারণা থেকে উদ্ভুত। মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সূত্র অনুযায়ী, উৎপাদন শক্তির সাথে উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে 'নতুন সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই মোতাবেক সামন্তসমাজ ভাঙ্গার ক্ষেত্রে কৃষি উদ্বৃত্তের মাধ্যমে পুঁজি গঠন এবং সেই পুঁজির মুনাফামুখিনতা, সৃষ্টি করে পুঁজিবাদী সমাজ। এই সমাজে উৎপাদনের উপায়গুলো বুর্জোয়া শ্রেণী তথা পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত থাকায় সামগ্রিক উৎপাদনে পুঁজির দৌরাত্ম চলতে থাকে। উৎপাদক শ্রেণী— শ্রমিক শ্রেণী থাকে উপেক্ষিত, শোষিত। এই শ্রমিক শ্রেণী (যা মূলত বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার ফলেই সৃষ্ট) হচ্ছে মার্ক্সের মতে সর্বহারা শ্রেণী বা শিল্প প্রলেতারিয়েত। পুঁজিবাদী বৈষম্য ভেঙ্গে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠায় এই শিল্প প্রলেতারিয়েতই (যা পুঁজির ক্রমাগত সঞ্জীভবনের মাধ্যমে সংখ্যাগুরু শ্রেণীতে পরিণত হয়) হচ্ছে মুখ্য শক্তি। পুঁজিবাদী শ্রেণী সমাজ থেকে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার মাঝখানে উৎক্রমনমূলক স্তর সমাজতন্ত্র— 'সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব'। অর্থাৎ শিল্প প্রলেতারিয়েতের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। এই ক্ষমতা কায়েম হয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে। কেননা মার্ক্সীয় মতধারায় রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যম— শ্রেণীদ্বন্দ্বের অমিমাংসেয় ফল এবং সমাজতন্ত্র হচ্ছে উৎপাদনের উপায়গুলোর উপর প্রলেতারিয়েতের কর্তৃত্বশীল মালিকানা আরোপের রাজনৈতিক ক্ষমতা।

মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের সহজ অর্থ হচ্ছে তা দরবারী সমাজতন্ত্র। এই সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপায়সমূহের সামগ্রিক মালিকানা সামাজিক নয় বরং রাষ্ট্রীয়। ফলে সামগ্রিক উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতে ন্যাস্ত। আর এক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতা মানেই সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব। কিন্তু রাষ্ট্রের এই ক্ষমতাই তো সামগ্রিক সর্বহারা শ্রেণী আসীন থাকতে পারে না। বরং সর্বহারা শ্রেণীর 'অগ্রসর অংশ' নামক গুটিকতেক শিল্প প্রলেতারিয়েতের হাতে ন্যাস্ত হয় এই ক্ষমতা। এই গুটিকতক শিল্প প্রলেতারিয়েতের বাস্ত ব অর্থ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। ফলে সর্বহারার একনায়কত্ব দাঁড়ায় কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কত্ব। আর পার্টির গঠনকাঠামো যখন ক্রমকর্তৃত্বতান্ত্রিক তখন পার্টির সর্বোচ্চ কর্তাটি একনায়ক হিসেবে আবির্ভাবের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করতে গিয়ে রুডলফ রকার সেন্ট সাইমনের অভিমত: "এমন দিন আসবে যখন মানুষজনকে শাসন-পরিচালনের কলাকৌশল লোপ পাবে। তার স্থলে জায়গা নেবে নতুন একটা কলাকৌশল। সেটা হলো বস্তু সামগ্রী-বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল।"— এর সাথে সহমত পোষণ করেন এবং এ সম্পর্কে বলেন,

> ... এটা [সাইমনের অভিমত] মার্ক্স ও তার অনুসারীদের লালন পালন করা এই তত্ত্ব ছুঁড়ে ফেলে দেয় যে, শ্রেণীহীন সমাজে যাওয়ার পথে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব হিসেবে গঠিত রাষ্ট্র একটা আবশ্যিক উত্তরণকালীন স্তর; আর এই স্তরে সকল শ্রেণী-সংঘাত এবং তারপর খোদ শ্রেণীগুলোই দূরীভূত হওয়ার পরে রাষ্ট্র নিজেই নিজেকে বিলোপ করে দেবে এবং দৃশ্যপট থেকে উধাও হয়ে যাবে। এই ধ্যানধারণা রাষ্ট্রের আসল স্বভাব চরিত্রকে এবং ইতিহাসে রাজনৈতিক ক্ষমতা নামক ঘটনাটার তাৎপর্যকে একদমই ভুলভাবে বোঝে, আর ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে। এই ধ্যানধারণা আসলে তথাকথিত অর্থনৈতিক বস্তুবাদের যৌক্তিক পরিণত মাত্র। অর্থনৈতিক বস্তুবাদ ইতিহাসের সমস্ত ঘটনা-লক্ষণ-প্রপঞ্চের মধ্যেই কোনো একটা সময়পর্বের স্রেফ উৎপাদন পদ্ধতিসমূহের অপরিহার্য ফলাফলই শুধু দেখতে পায়। এই তত্ত্বের প্রভাবে লোকজন বিভিন্ন আকার-প্রকারের রাষ্ট্র এবং অন্য সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সমাজের 'অর্থনৈতিক অট্টালিকা-কাঠামোর' ওপরে দাঁড়ানো 'আইন-বিষয়ক ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো' হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছিল; এবং লোকজন ভেবেছিল এই তত্ত্বের মধ্যে তারা প্রত্যেকটা ঐতিহাসিক ঘটনামালার চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছে। বাস্তবে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য পরিচালিত বিশেষ বিশেষ লড়াই সংগ্রাম কিভাবে একটা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশধারাকে শত শত বছরের জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছে বা ব্যহত করেছে ইতিহাসের প্রত্যেকটা পর্বই আমাদেরকে তার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত সরবরাহ করে। (রুডলফ রকার: নৈরাজ্যবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সেলিম রেজা নিউটন অনূদিত, অপ্রকাশিত)

রকার রাষ্ট্রভিত্তিক সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন,

> ... সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন যে রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়েছে সেই রাষ্ট্র পুরাতন শাসকশ্রেণীসমূহের বিশেষ অধিকারগুলোর ইতি টানতে পারে বটে, কিন্তু এটা সে করতে পারে তাৎক্ষণিকভাবে নতুন আরেকটা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণী খাড়া করার মাধ্যমেই, যে শ্রেণীটাকে তার প্রয়োজন পড়বে নিজের শাসকগিরি বজায় রাখার জন্য। (রুডলফ রকার: নৈরাজ্যবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সেলিম রেজা নিউটন অনূদিত, অপ্রকাশিত)

সমাজতন্ত্র স্বাধীনতা ছাড়া অর্থহীন। রাষ্ট্রবিহিত সমাজতন্ত্রে সেই স্বাধীনতা তো নে-ই, উপরন্তু তা এক নতুন ধরনের বৈষম্য-শৃঙ্খলে মানুষকে শৃঙ্খলিত করে। কাজেই মুক্তির প্রশ্নে মার্ক্সবাদ খুবই বিবেচ্য বিষয় কিন্তু হুবহু অনুসরণীয় নয়।

মুক্তির পথ: কর্তৃত্ব-বধ ও সহজাত আকাঙ্ক্ষার নির্মিতি...

কর্তৃত্বের কবল থেকে মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সহজাত। কর্তৃত্ব এবং সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের উচ্ছেদের মাধ্যমেই কেবল মানুষের মুক্তি সম্ভব। মানুষের এই মুক্তি শুধুমাত্র গণতন্ত্র নয়, সাথে সাথে সমাজতন্ত্রকেও দাবি করে। মিশেল ফুকো বলেন,

> গণতন্ত্র বলতে কেউ যদি, শ্রেণীবিভক্ত নয় কিংবা ক্রমতান্ত্রিকভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত নয় এমন একটা জনসমষ্ঠির দ্বারা, ফলপ্রসু ক্ষমতার চর্চা বলে মনে করেন তাহলে সুস্পষ্টভাবেই আমরা গণতন্ত্র থেকে বহুদূরে অবস্থান করছি। সেই সাথে এটাও সুস্পষ্ট যে, আমরা বাস করছি একটা শ্রেণী-একনায়কতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর অধীনে ও শ্রেণীক্ষমতার অধীনে, যে শ্রেণীটি সহিংসতার মাধ্যমে নিজেকে চাপিয়ে দেয়, যদিও হতে পারে যে তাদের এই সহিংসতার হাতিয়ারগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ও সংবিধান সম্মত। ((মুখোমুখি নোম চমস্কি এবং মিশেল ফুকো/ মানবপ্রকৃতি: ন্যায়নিষ্ঠা বনাম ক্ষমতা: আ আল মামুন অনুদিত, পৃ:৮১, ৮২)

কর্তৃত্ব তথা অসম ক্ষমতা সম্পর্কের উচ্ছেদ এবং কেবলমাত্র উচ্ছেদের মাধ্যমেই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ফলপ্রসু চর্চা সম্ভব। আর এই ক্ষমতা সম্পর্কের উচ্ছেদ মানেই ভূমির অসম মালিকানার স্থলে যৌথ-পঞ্চায়েতী সামাজিক মালিকানা, শ্রমের উদ্বৃত্ত শোষণের স্থলে উৎপাদন যন্ত্রে শ্রমের প্রতিষ্ঠা, দেহগত ও লৈঙ্গিক আধিপত্যের স্থলে জৈব সংহতি এবং ভাষিক-সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানগত আধিপত্যের স্থলে সমতা ও ভাষা-সংস্কৃতি-জ্ঞানের সামাজিক পরম্পরাগত প্রসার। আর এইজন্য জরুরী হচ্ছে সমাজের প্রবাহমান নানান ধরণের সম্পর্ক ও প্রপঞ্চগুলোকে বোঝাপড়া করা, এগুলোর মধ্য থেকে কর্তৃত্বপরায়ণ উপাদানগুলোকে চিহ্নিত করা এবং তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা— চ্যালেঞ্জ করা। মানুষই ইতিহাসের নির্মাতা। ফলে কোনো শাস্ত্রবাদী সূত্র মেনে সমাজ পরিবর্তিত হয় না। সমাজ পরিবর্তিত হয় শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র মানুষের জাগরণের মাধ্যমে— তার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ-আন্দোলোনের মাধ্যমে। এই প্রতিরোধ-আন্দোলনকে হতে হবে মানুষের সহজাত-স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু সংগঠিত প্রচেষ্টার প্রতিকৃতি।

প্রতিরোধ-সংগঠন: চিন্তা-সৃজন-সংগ্রামের সংহতি-প্রচেষ্টা

সংগঠন হচ্ছে একটি বিশেষ লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তা বাস্তবায়নের জন্য কিছু মানুষের মধ্যে চিন্তা, সৃজন ও তৎপরতার সংহতি। পারস্পারিক যোগাযোগ ও দায়বদ্ধতাই এই সংহতির প্রধান ভিত্তি। সুতরাং সত্যিকারের প্রতিরোধ-সংগঠন হতে হবে ক্রমকর্তৃত্বতন্ত্রমুক্ত একটা জিনিস। ক্রমকর্তৃত্বতন্ত্র বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। সাধারণত পলিটিক্যাল পার্টি কিংবা অনান্য প্রতিষ্ঠানে কাজের দায়িত্ব ভাগ করার নামে নানান ধরণের পদ তৈরি করা হয়। এই পদগুলোকে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাও দেয়া হয়। ফলে ক্ষমতার নির্দিষ্টতা অনুসারে উপরতলা-নিচতলা তৈরি হয়। সাধারণত উপরতলার প্রধান ব্যক্তিটি হন সভাপতি আর তারপর ক্রমঅনুসারে সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক প্রভৃতি পদ বিন্যস্ত থাকে। এখানকার সাধারণ সংস্কৃতি হচ্ছে: উপরতলার লোক নিচতলার লোককে হুকুম বা নির্দেশ দেবেন এবং নিচতলার লোক বিনা বাক্যব্যায়ে তা পালন করবেন। আর এটা করতে পারলেই নিচতলার লোক একদিন উপরতলায় যেতে পারবেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে মূলত ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠানের গুটিকয়েক লোকের হাতে ন্যাস্ত হয়ে পড়ে। এবং এই গুটিকয়েক লোক সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠেন। ফলে ক্রমকর্তৃত্বতন্ত্র ক্ষমতার কেন্দ্রানুগতাকেই ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্র-কর্তৃত্বকে জায়েজ করার জন্য নানান ধরণের পলিটিক্যাল পার্টি ঘরানা থেকে 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'র আওয়াজ শোনা যায়। একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' জিনিসটি একটি মিথ। গণতন্ত্র বলতে প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা-সাম্য-সংহতি'র নিশ্চয়তাকে বোঝায়। কিন্তু কেন্দ্র মানেই অসম ক্ষমতা— অপরের উপর কর্তৃত্ব। আর সম্পর্ক যখন কর্তৃত্বমূলক তখন সেখানে সংহতি থাকতে পারে না। সংহতির নামে খুবই নিস্প্রাণ যান্ত্রিক একটা সম্পর্ক টিকে থাকে। ফলে গণতন্ত্র ও কেন্দ্র সমার্থক হতে পারে না।

প্রতিরোধ-সংগঠনের প্রধান কাজ হচ্ছে কর্তৃত্ব-ক্ষমতা-আধিপত্যের সম্পর্কগুলোকে পাঠ করা, সমাজের মধ্যে বিদ্যমান এই সম্পর্কগুলোকে প্রশ্ন করা এবং তা সমূলে উৎপাটনের জন্য কর্মতৎপরতা সংগঠিত করা। এই কর্মতৎপরতার প্রধান শক্তি হচ্ছে গণমানুষ। একমাত্র এবং একমাত্র গণমানুষের সম্মিলিত মুক্তিমুখীন প্রতিরোধ আন্দোলনই পারে তাকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে— কাঙ্ক্ষিত মুক্তির সমাজ নির্মাণ করতে।

০৪.০৪.০৮, রা.বি

লেখক পরিচিতি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী ও কর্তৃত্ব-বিরোধী তৎপরতার সাথে যুক্ত।